সাধারণের অসাধারণ কথা

শারদীয়া সংখ্যা ২০১৯

প্রাককথন

এই শারদীয়া পূজা সংকলনটি
সাধারণ মানুষের হোয়াটসআপ বার্তার ভিত্তিতে রচিত –
অদ্ভুত শোনালেও এটি খাঁটি সত্য !
যাঁদের লেখা আছে এখানে,
তাঁরা কেউ পেশাগত হিসেবে তো বটেই, নিয়মিত লেখকও নন।
কেউ কেউ ফেসবুকে ইতি–উতি লেখেন বটে,
কিন্তু সে লেখার দৈর্ঘ্যও কমেন্টের থেকে খুব বেশি দূর এগোয় না।
আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে
তাঁরা তাঁদের লুকোনো প্রতিভার এক আশ্চর্য বিকাশ ঘটিয়েছেন,
এবং আশ্চর্যজনক ভাবে,
লিখে ফেলেছেন এক একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা !

মায়ের আবাহনের এই পুণ্যলগ্নে
তাঁদের সৃষ্টির সে সংকলন আপনাদের হাতে তুলে দিলাম –
শারদীয়া উপহার হিসেবে।
এতে কোথাও কোন কপিরাইট নাই, কাজেই পড়ে যদি ভালো লাগে,
স্বচ্ছন্দে বিতরণ করতে পারেন আপনার প্রিয়জনেদের।

লেখনী মানব–মনীষার শ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ, সে সম্পদে আমরা সবাই ধনী,
কিন্তু খোঁজ রাখি না – খোঁজ পেলেও বিশ্বাস করতে মন চায় না,
সে মানসিক অচলায়তন ভাঙ্গাই এই সংকলনের প্রধান চালিকাশক্তি।

প্রার্থনা করি, পুজো ভালো কাটুক, মঙ্গলময় হোক,
মায়ের আশীর্বাদ ঝরে পরুক সকলের উপর।

এই বইটি একটি হাইপারলিংকড পিডিএফ

(.... সেটা কি, খায় না মাথায় দেয় ?)

কিচ্ছু না, এর মানে হলো -

যে গল্প, কবিতা পড়তে চান, যে ছবি দেখতে চান

সূচীপত্রে তার নামে ক্লিক করুন, সোওওজা সেইখানে পৌঁছে যাবেন

আবার

মাঝে মাঝেই দেখবেন পাতার কোণে লেখা "সূচীপত্র"

সেটিতে ক্লিক করলে আবার ব্যাক টু সূচীপত্র

..

ব্যাস ! এইটুকুই

সূচীপত্র

একটি ভালোবাসার গল্প অথবা কবিতা	অনুভূতি চট্টোপাধ্যায়
হাতিশুঁড় গ্রামের গল্প–কথা	সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
দুর্যোধন সিনড্রম	অরুনোদয় সিনহা
মূর্তিপূজা	অরুনোদয় সিনহা
পরিব্যক্ত বাঙালি	চন্দন মাইতি
মৃত্যু, সময়, অজুহাত, প্রেম	অভিষেক চক্রবর্তী
অংশুমানীয় মনন	অংশুমান নন্দী
শনৈ শনৈ	মাধুরী সিনহা
দুই পাখি	অন্তরা মিত্র
দৃষ্টি	সৌমিক পাইন
মৃত্যু ও মায়া	কৌস্তুভ চৌধুরী
ছেলেবেলার রেল–প্রেম	কৌস্তুভ চৌধুরী
আসাম ভ্রমণ	কৌস্তুভ চৌধুরী
ঘটনাক্রম	বিপ্লব দেবনাথ
রেল–ফ্যান	বিপ্লব দেবনাথ
ফেলে আসা শৈশব	সৈকত সাধু, গোপীনাথ পাল, চন্দন মাইতি
সেরকম কিছু নয়	কৃষ্ণেন্দু দাস
চুটকি হাসি	রাজেন্দ্র আচার্য
আমি	সৈকত সাধু
আমার দেশ	বিপ্লব রায়
ইরেজার	সৌরভ ঘোষ
হিন্দি কবিতা ১	সৈকত সাধু
হিন্দি কবিতা ২	বিশ্বজিত প্রামাণিক
একটি রাত	সুরজিত দুবে
সত্যি ভুতের ঘটনা	সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

কবিতা

ভুলো না	অংশুমান নন্দী
হঠাত দেখা	অন্তরা মিত্র
স্বপ্ন	অভিষেক চক্রবর্তী
ঋণ	চন্দন মাইতি
কার পৃথিবী	সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
পরাজিত সৈনিক	সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
জয়ী	সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
গোটা ডিম	সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
ছক	সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
তুমি আর আমি	সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
আশা	সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কুঁড়ে ভুত	সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
সুপ্রভাত	সৈকত সাধু
লেখাটা আমার আসে না	গৌতম বড়ুয়া
বাংলা	বিশ্বজিত প্রামাণিক
অঝোর ধারা	সৌমেন্দু সন্ন্যাসী
জীবনানন্দের প্রতি	অরুনোদয় সিনহা
স্বপ্ন	নীলাঞ্জন অধিকারী
স্বাধীনতাকে	নীলাঞ্জন অধিকারী

কচিকাঁচাদের আঁকিবুঁকি

আদিশ্রী নন্দী, অহম ব্যানার্জী
অনিকেশ দাস, অর্ঘকমল সিনহা
সিদ্ধিক্ষা কৃষ্ণন, রাজদীপ মুখোপাধ্যায়, শ্রেয়সী আচার্জী,
সোহিনী পাল, তিতাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীজাতা আচার্জী
শুভশ্রী আচার্জী, রিক্তম সাধু, ঐশিকি সিনহা, নৈঋত অধিকারী

.... আর লেখালেখি

অর্ঘকমল সিনহা
তিতাস মুখোপাধ্যায়

লেখক লেখিকা পরিচয়

একটি আবেদন

প্রচ্ছদ পরিচয়

একটি ভালোবাসার গল্প অথবা কবিতা

অনুভূতি চট্টোপাধ্যায়

সত্যি বলছি তোমার সামনে দাঁড়ালে মনে হয় আমার কোনো দেশ নেই।
কোনো ধর্ম নেই আমার।
তোমার সামনে দাঁড়ালে জীবনের সমস্ত না পাওয়াগুলো এক লহমায় ভুলে যেতে পারি।
আবার উল্টোটাও - যা পেয়েছি এ জীবনে সে সবও তুচ্ছ মনে হয় তুমি কাছে থাকলে।
তুমি পাশে থাকলে হেরে যেতে ভালো লাগে।
ভালো লাগে নত হতে।
তোমার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে অনেক ছোট মনে হয়।
অথচ তুমিই কিন্তু বড় হতে শিখিয়েছ।
তুমিই শিখিয়েছ ভাষা।
যে ভাষা প্রতিবাদের,প্রতিরোধের, ভালোবাসারও।
তোমার পরিচয়?
তুমি আমার ঘরের আনাচে কানাচে অগোছালো ভাবে ছড়িয়ে থাকা কিছু বই।

পূর্বরাগ আগেই ছিল, কিন্তু প্রকৃত প্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য দায়ী আমার দাদু। দেশভাগের সময় সহায় সম্বল হীন হয়ে নিজের সমস্ত শিকড় থেকে উৎপাটিত হয়ে এদেশে চলে আসা আরো লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া একটা মুখ - আমার দাদু।
ছিন্নমুল হয়ে আসা ওপার বাংলার আরো মানুষের মতো দাদুও এদেশে এসে আঁকড়ে ধরেছিল দুটোই জিনিস - এক, কমিউনিস্ট পার্টি আর দুই, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।
এই দুটো জিনিসের মধ্যে ওই আক্ষরিক অর্থে সর্বহারা মানুষগুলো নিজেদের খুঁজে পেয়েছিল।

কিন্তু দাদুর সত্যিকারের ভালোবাসা ছিলো অভাবের সংসারে পয়সা বাঁচিয়ে কেনা ওই অমূল্য রতন বইগুলো, তার প্রভাব থেকে আজও আমি মুক্ত হতে পারলাম না। যত বড় হচ্ছি তত বুঝতে পারছি ওই অফুরন্ত বইয়ের জগৎ আমার চিন্তা চেতনায় প্রতিনিয়ত আঘাত করে চলে। আমাকে ঘুমোতে দেয়না ওরা।

আমার দেশের কৃষকের আত্মহত্যা, হাজার শ্রমিকের কাজ হারানো, লক্ষ বেকারের দীর্ঘশ্বাস, আবার আমাজনের আগুন - এদের কোনোকিছুই আমার জীবনে কোনো অসুবিধা করছে না, এইটা আমি ভাবতেই পারছি না ওই হতচ্ছাড়া বইগুলোর জন্য।
আমি ঘুমিয়ে গেলেও আমাকে জাগিয়ে দিচ্ছে ওই বইগুলোর পাতা থেকে উঠে আসা কুবের মাঝি, অপু, উদয়ন পণ্ডিত আর পাভেলরা।

এই বইগুলোই আবার -

আমাকে নিঃসঙ্গতা শিখিয়েছে
নিজেকে নিজের সাথে কথা বলতে শিখিয়েছে
আমার নিপাট শৈশব আর অসংলগ্ন কৈশোরকে আমার সামনে বেআব্রু করে ছেড়েছে।
আমার বর্তমান আমাকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় দেখায়
আর তুমি ভবিষ্যতের জন্য সাহস সঞ্চয় করতে শেখালে।
জানিনা তোমার জন্য অমরত্ব তাচ্ছিল্য করতে পারব কি না, শুধু এটুকু বলতে পারি
এ জীবনে আর কোনো দ্বিতীয় ইশ্বরের প্রয়োজন পড়বে না।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই সম্পদ যেন পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে যেতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রাখতে মন চায়। এদিকে হঠাৎ কয়েকদিন ধরে লক্ষ করছি আমার তিন বছরের মেয়ে তার কোনো কিছু মতের বিরুদ্ধে গেলেই বলে কিনা বই ছুড়ে মারবো। যে কোনো যুদ্ধের জন্যই ওর থেকে ভালো অস্ত্র যে আর নেই সেটা ও এই বয়সে বুঝলো কি করে কে জানে।

সূচীপত্র

হাতিশুঁড় গ্রামের গল্প-কথা

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

(১)

হাতিশুঁড় গ্রামের নামের পেছনে যে কি কারণ তা গ্রামের কারোর জানা না থাকলেও এক এক জনের মুখে এক এক রকম গল্প শোনা যায়, আর প্রত্যেকটাই নিজের মত করে বানানো। কদিন আগেই তারক মাষ্টার রোয়াকে বসে এই সব গল্পই করে যাচ্ছে, হঠাৎ কোথা থেকে গুচ্ছেক চ্যাংড়া ছেলের দল এসে ভিড়ল ওখানে, কথায় কথায় খালি অবিশ্বাস ওই সব ছেলে ছোকরাদের।

তারক মাষ্টার দেখল এরা থাকলে গল্প জমানো মুশকিল, তাই উঠে যাওয়াই উচিত মনে করে যেই না দাঁড়িয়েছে, ওই ছোকরাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করে বসল - তা খুড়ো, মুখুজ্জে বাড়িতে পয়সা কি বাড়াল না সেই পুরনো হিসেব?

তারক মাষ্টার স্কুলে পড়ায় না, বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিউশন করে । তা ওই শরৎ মুখুজ্জের বাড়িতে বড় ভাই, মেজ ভাই, ছোট ভাই আর কিছু আশেপাশের আত্মীয়দের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে মোট তেরোজনকে পড়ানোর ঠিকা একসাথে দিয়ে বাচ্চা প্রতি দু টাকা করে ছাব্বিশ টাকা ধার্য হয়েছে, নইলে এমনিতে মাথা পিছু পাঁচ টাকা নেওয়া হয়।

ছোকরার কথা শুনে তারকনাথের মাথা গরম, জিজ্ঞেস করল - কেন হে, তোমাকে ঢোকাচ্ছে নাকি ওই ব্যাচে ! ছোকরা ছাড়বার পাত্র নয়, বলে - রাগ কোরনা কাকা, কিন্তু পুকুর ঘাটে চান করতে গিয়ে ঘরের মেয়েছেলেরা যা শুনছে তাতে একটা ব্যাপার বেশ বোঝা যাচ্ছে, ওই মুখুজ্জে বাড়ির মহিলাদের কথায় বার্তায় দিন দিন বেশ শিক্ষার ছাপ পাওয়া যাচ্ছে, তা এই পরিবর্তন হল কি করে, এ সব তো তোমারই কাজ।

তারক মাষ্টার কিছুটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করে - এতে আমার কি কাজ খুঁজে পেলে হে তুমি?

- কেন নয়, তুমি যখন বাড়ির বাচ্চাগুলোকে পড়াচ্ছো , সে পড়া তো বাড়ির মহিলারাও পাশেই রান্না ঘর থেকে শুনছে, তাহলে তুমিই বল, ওরা শিখছে কি শিখছে না? তা না হলে কথাবার্তায় অমন পরিবর্তন কি এমনি এমনি হয় কাকা!

বেশ চিন্তায় পড়ল তারক মাষ্টার, দেখা করল একমাত্র বিশ্বস্ত মানুষ মুকুন্দ বাঁড়ুজ্জের সাথে। সব কথা খুলে বলে, মতামত জানতে চাইল। উত্তরে মুকুন্দ বাঁড়ুজ্জে এক মতলব বাতলে দিল

- তুমি এক কাজ কর হে মাষ্টার, কদিন নাহয় আস্তে আস্তে পড়াও, দেখ কিছু পতিক্রিয়া পাও কিনা।
কথা মত কাজ শুরু করল তারক মাষ্টার, ফিসফিস করে পড়াতে লাগল - অ, অ তে অজগর, আ, আ তে আম।
একদিন যায় দুদিন যায়, ঘরের মহিলারা ভাবতে লাগল কি ব্যাপার, কদিন ধরে মাষ্টারের গলা পাওয়া যাচ্ছে না। আগে বেশ চিৎকার করে পড়াত, তবে কি শরীর খারাপ! চা দিতে গিয়ে বাড়ির মেজ বউ জিজ্ঞেসই করে বসল - মাষ্টার মশাই, আপনার শরীর ঠিক আছে তো ?
- কেন শরীরের আবার কি হল!
-না আসলে কদিন ধরে আপনার গলা শুনতে পাচ্ছি না তো, তাই আর কি।
ব্যাস আর যায় কোথা! লাফিয়ে উঠল তারক মাষ্টার। আচ্ছা, এতদিন ধরে ঠকানো হচ্ছিল তাহলে। এ তো ছোটখাটো ব্যাপার নয়, পুরো জালিয়াতি কেস।
হনহন করে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল তারক মাষ্টার - হুঁ হুঁ বাবা, বোকা পেয়েছ, আমি বোকা, না? কিছুই বুঝি না ভেবছ। এই চল্লাম, ওই টাকায় গোটা ঘর গুষ্টি পড়বে ভেবেছ, খুব মজা না !
বাড়ির মেজ বৌ কি করবে, কি বলবে, বুঝতে না পেরে ছেলে ঘন্টু কে বলল - যা দেখি তাড়াতাড়ি তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আই, বড়পুকুর ঘাটে গেছে দেখবি ভাগের মাছ আনতে।

(২)

ওদিকে একুশ পরিবারের মালিকানার পুকুরে মাছ ধরার পর ভাগাভাগি চলছে। সে এক যুদ্ধের পরিবেশ আর কি, গায়ের অথবা মুখের জোর যার বেশি, সেই নিয়ে যাবে পছন্দসই মাছ।
এদিকে মুখুজ্জে বাড়ির মেজ ছেলে রঘুনাথ ধরেছে এক গোঁ। কালিবাউশ মাছটাই তার চাই। চিৎকার আর প্রবল ঝগড়াঝাঁটি করে শেষমেশ আদায় করতেও ছাড়েনি সে। মহা আনন্দে মাছ নিয়ে হাসি মুখে বাড়ি ফিরছিল, কিন্তু হাসি মুখে বেশিক্ষণ কেউ থাকতেই পারে না ওই গ্রামে।
একে একে নরহরি চাটুজ্জে, হরিহর মন্ডল, বামাপদ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে গ্রামের কমবয়সী ছেলেরা সবাই দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতে লাগল - কি, শেষ পর্যন্ত কালিবাউশ মাছটাই পেলে তো ? প্রথম প্রথম না হয় উত্তর দেওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু একই উত্তর দিতে দিতে, তাও আবার যখন বুঝল কয়েক জন ঘুরেফিরে বারেবারে এসে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে,

মাথা যে কখন গরম হয়ে গেছে, মাছ কখন যে হাত থেকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে সে খেয়ালও নেই।

মনে মনে সন্দেহ হতে শুরু করল রঘুনাথের , কাল থেকে গ্রামের সবাই কালিবাউশ নামেই না ডাকতে শুরু করে ! কখন যে রাস্তার মাঝে ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে বলে গেল মাষ্টার ছেড়ে যাওয়ার কথা, সঙ্গে বোধহয় ওই কালিবাউশ মাছের কথাটাও জিজ্ঞেস করে গেল, সেদিকে আর হুঁশ নেই। সারারাত চিন্তায় চিন্তায় ঘুম আসে না রঘুনাথের, আজ বত্রিশ বছর ধরে ঠাকুরদার দেওয়া প্রিয় নামখানা বয়ে ব্যাড়াচ্ছে, কাল থেকে গ্রামের লোকে হয়ত কালিবাউশ নামেই ডাকবে।গ্রামের নতুন প্রজন্ম হয়তো জানতেই পারবে না ওর আসল নাম কি ছিল। চিঠি পত্তর এলে আসল নাম দেখে তো খুঁজেই পাবে না ওকে। চিন্তায় চিন্তায় সারারাত না ঘুমিয়ে সকাল হতেই বাইরে বেরিয়ে পড়ল রঘুনাথ। কি হতে চলেছে না জানলে শান্তি নেই। পথ মধ্যে হারু জ্যাঠা দেখেই জানতে চাইল - হ্যাঁ রে, কালিবাউশ মাছটা কি দোষ করেছিল? অমন করে ছুঁড়ে দিলি।

ব্যাস হয়ে গেল। আর পরীক্ষার দরকার নেই, রঘুনাথ গোমড়া মুখে বাড়ি ফিরে এল।

(৩)

তারক মাস্টারের সবচেয়ে ভালো ছাত্র বলে পরিচিত জ্ঞানদাচরণ ক্লাস নাইনের হাফ ইয়ারলিতে ইতিহাসে চব্বিশ নম্বর পাওয়ায় বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গেছে। মাষ্টারকে সামনে বসিয়ে বাড়ির লোকজন ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে। শুধু নম্বর কম পাওয়াটাই বিষয় নয়।

ক্লাস-টিচার বলে পাঠিয়েছে জ্ঞানদা নাকি পরীক্ষার দিন মাত্র কুড়ি মিনিটে খাতা জমা দিয়ে এসেছিল। তারক মাষ্টার সবাইকে চুপ করতে বলে জিজ্ঞেস করলেন - তা বাবা, নম্বর কম পেয়েছ ঠিক আছে, কিন্তু কুড়ি মিনিটে খাতা জমা করতে গেলে কেন ? আর তাছাড়া পরীক্ষার পর তো বলেছিলে দু বার নাকি রিভাইজ করেছ !

জ্ঞানদা চরন মুখে একটুখানি হাসি হাসি ভাব এনে বলল - স্যার আমি ঠিকই বলেছিলাম, যা লিখেছিলাম তা দুবার রিভাইজও করেছিলাম। কিন্তু, খাতা জমা করলাম কেন জানেন, ভাবুন, কুড়ি মিনিট লিখে চব্বিশ পেয়েছি। যে হারে সেদিন আমি লিখছিলাম যদি পুরো সময় লিখে যেতাম, কি কান্ডটাই না হত বলুন তো! ফুল মার্কস ছাড়িয়ে কোথায় যে যেত, দেশে হয়তো নতুন আইন আনতে হত !

আমাকে নিয়ে দেশে বিদেশে টানাটানি, কি যে হত ভাবা যায়? তাই সাত পাঁচ ভেবে দেখলাম,

আগে ভাগে ব্রেক না কষলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ব।
তারক মাষ্টার কিছুক্ষণ ভেবে বললেন - কাজটা না হয় ভালোই করেছ, তবে বাপু ব্রেকটা একটু পরে কষলে যদিও রিস্ক ছিল তবু মনে হয় ভাল হত।
জ্ঞানদার ঠাকুরদা বলেই দিলেন তারক মাষ্টারকে - শোন মাষ্টার তুমি বরং একটু রয়ে সয়ে পড়াও। পড়ানোটা মনে হচ্ছে বেশি মাত্রায় হয়ে যাচ্ছে।

(৪)

ইদানিং শ্যামাপদ ওর গুমটি দোকানের লোকসান নিয়ে খুব চিন্তিত। লোকসানের কারণ হল লোকজনের দাম না দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া। আর সেটা হচ্ছে ঠিক যখন শ্যামাপদ একদিন আগের সংবাদপত্রখানা মুখের সামনে তুলে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করেছে ঠিক তখনই। কখনো পাউরুটি, কখনো বিস্কুট যে যা পারছে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ পয়সা রেখেও যায়, তবে না রাখার সংখ্যাটাই বেশি। একদিন তো আবার বাসী পাউরুটি অর্ধেক খেয়ে গন্ধ লাগায় কে যেন বাকি অর্ধেকটা ফেরতও দিয়ে গেল । এদিকে চুরির ভয়ে পেপারের নেশা কাটানো উচিত কম্ম নয়। সমস্যার কথা গিয়ে পাড়ল মুকুন্দ বাঁড়ুজ্জের কাছে। মুকুন্দ বাবু সব শুনে জিজ্ঞেস করলেন - ইংরেজী পড়তে পার?
-আজ্ঞে না।
- তবে তুমি এক কাজ কর। কদিন ইংরেজি পেপার কিনে পড় বরং। অজানা অক্ষর হওয়ায় মন বসাতে পারবে না, চোর কিন্তু স্বভাব দোষে চুরি করতে আসবেই। তখন খেয়াল করে চোরকে ধরো।
কথা অনুযায়ী কাজ হল, কিন্তু ফল হল না। চুরি হয়েও গেল আর কিছু বোঝাও গেল না। মুকুন্দ বাবু ভুরু কুঁচকে কারণ জানতে চাইলে, শ্যামাপদ জানাল - আজ্ঞে একটা কথা লজ্জা পেয়ে বলা হয়নি, আমি বাংলা পড়তেও জানি না। আসলে ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করি। ইংরেজি পেপারে ছবি আরও সুন্দর, তাই মন আরও গভীরে চলে গেছিল।

(৫)

কৃষ্ণকান্ত হালদারের অনেকদিনের ইচ্ছে গ্রামে একটা ব্যায়ামাগার খুলবে, সে ইচ্ছে পুরণ করতে খুলেও ছিল, কদিনে লোকজন আসাও শুরু করল, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের মনে হল আগে থিওরী ভালো ভাবে না জানলে প্রাকটিক্যালটা ভালো হয় না। তাই নিয়ম জারি করল

প্রথমে চলবে থিওরী ক্লাস, পরে হাতেনাতে ব্যায়াম করা যাবে। সে মত বেশ কিছু শরীরচর্চার উপর বইও কিনে আনা হল। বেশ কিছুদিনের মধ্যে বইয়ের সংখ্যা বাড়তে লাগল, গ্রামের অনেকেই ভালোবেসে বই দিয়ে যাওয়া শুরু করল । প্রথম দিকে বই আসত দৈহিক কসরতের উপর, সেটা হয়ে গেল যোগাসনের উপর, সেটা হতে লাগল কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি, ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক বিভিন্ন বই আসতে দেখে গ্রামের একদল তখন নাস্তিকতার উপর বই দেওয়া শুরু করল। এরপরে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত থেকে বিভূতিভূষণ সবই আসতে লাগল একে একে। এভাবেই কৃষ্ণকান্তের ব্যায়ামাগার রূপ নিলো বর্তমান পাঠাগারের। বহু চেষ্টা করেও কৃষ্ণকান্ত হালদার ব্যায়াম আর শেখাতে পারল না।

(৬)

তারক মাষ্টার বলেই ফেলল যদুনাথ কে- তোমার অঙ্কে এবার পাশ করা হচ্ছে না, যা হাল দেখছি শূন্য ছাড়া কিছুই পেতে পার না।

চকিত নয়নে চেয়ে রইল যদুনাথ - বলেন কি মাষ্টার মশাই, সে না হয় একটু এদিক ওদিক হয় অঙ্ক কষলে, কিন্তু পাশ ঘেঁষেই তো যাচ্ছে। পাশ আমি করবই স্যার, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।

তারক মাষ্টার ব্যঙ্গ করেই বলল - দেখা কোরো তাহলে রেজাল্ট বেরোনোর পর।

পরীক্ষার দিন, এক্সটারনাল গার্ড দেওয়া দিদিমণির মুখের দিকে চেয়ে যদুনাথের চোখ দিয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ব্যস্ত হয়ে দিদিমণি কারণ জিজ্ঞেস করতে, যদুনাথ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলল - ছোটবেলায় মা মারা গেছে, মুখখানা ভালো করে মনে পড়ত না, আজ আপনাকে দেখে ঠিক মায়ের মুখটা মনে পড়ে গেল।

তারপর যা হল তা ইতিহাস, দিদিমণির কৃপাদৃষ্টি পড়ায় অনায়াসে পাশ মার্কস তুলে নিলো যদুনাথ। রেজাল্টের দিন তারক মাষ্টারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে গেল।

(৭)

বছর পঁচিশ আগে নীলকান্ত প্রথম বারের জন্য মাধ্যমিকে ফেল করে। তারপর আট বার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল নীলকান্ত। কিন্তু, দুঃখ রয়ে গেল ইংরেজিটা ঠিকমত শেখা হল না বলে। ইংরেজি ভাষার রেওয়াজটা তাই এখনও বজায় রেখেছে ও। কথায় কথায় দু একটা ইংরেজি বেরোবেই। কিছু কিছু নতুন শব্দও আবিষ্কার করে ফেলেছে এর মধ্যেই, যেমন -

থ্যাটিস্কোয়ার, বাইট্রাঙ্গুলার ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার যখন গ্রামের স্কুলে কিছু বিদেশী লোকজন ডকুমেন্টারি না কি যেন বানানোর জন্য এসে হাজির হল, গাঁয়ের দুচার জন মাতব্বর হেডমাষ্টারকে আগে ভাগেই গিয়ে বলে আসল - যতই ফেল করা ছাত্র হোক না কেন, তবু অধ্যবসায়ের তো একটা দাম আছে। এত বছরের তপস্যা যখন, ফল তো কিছু না কিছু জুটবেই। আপনি ওই নীলকান্তকে অবশ্যই রাখবেন কথা বলার সময়।

হেড মাষ্টার লক্ষ করলেন বিদেশীদের মধ্যে সবচেয়ে মোটা যে লোকটা, তার সাথে নীলকান্তের ভীষণ ভাব জমে উঠেছে। নীলকান্ত কিছু বলছে আর সাহেব হেসে লুটোপুটি খায় , আবার সাহেব কিছু বলছে তো নীলকান্ত হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। কিন্তু, মুশকিল হল দুজনের কথা মনে হচ্ছে কেবল দুজনেই বুঝছে, হেডমাস্টার বেশ কয়েকবার শোনার জন্য পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেলেও একবর্ণ বুঝে উঠতে পারল না।

(৮)

হরগোবিন্দ সেদিন ধান ক্ষেতের আল ধরে হেঁটে যেতে যেতে লক্ষ্য করল মহেশ তাঁতী পাশের মাঠে গরু-মোষ চরাতে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। হরগোবিন্দের মাত্র দুটো দোষ, এক, মনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চিন্তা জাগতে থাকে, দুই, একবার চিন্তা জাগলে সঠিক সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই, শরীরটাও যেন কেমন করতে থাকে । এ নিয়ে বড় চিন্তায় পড়ে আছে হরগোবিন্দ।

মুকুন্দ বাঁড়ুজ্জের কাছে গিয়ে সমস্যার কথাটা পেড়েও ছিল একবার। তা মুকুন্দ বাবু বুদ্ধিমান লোক, আগে ভাগেই সাবধান করে দিলেন হরগোবিন্দকে, বললেন - এ কথা রটে গেলে তো মহা মুশকিল হে! লোকজনের সবচেয়ে কঠিন কাজ হল চিন্তা ভাবনা করা, তোমার ওই বদভ্যাসের খবর একবার রটে গেলে কেউ তো আর চিন্তা ভাবনা করবেই না। সবাই তোমার উপর নিজের চিন্তা দেবে চাপিয়ে। সন্তানের সব চিন্তা, বিষয় বস্তুর সব চিন্তা, আমাশা থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য, সব চিন্তাই তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে বাকি সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়বে। তাই মহেশ তাঁতীকে দাঁড়িয়ে ঘুমাতে দেখে যখন মনে চিন্তা জাগল, কি করে এমন হয়, কি করে একজন দাঁড়িয়ে ঘুমায়, পড়ে গেলে কি হবে-এইসব, কাউকে জিজ্ঞেস করতেও পারছে না, আবার উত্তর না পেলেও শান্তি নেই।

রাতের বেলা মহেশের বাড়িতে উপস্থিত হল হরগোবিন্দ, সরাসরি খুলে বলল মনের চিন্তাগুলো, শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল মহেশ তাঁতী, অবাক হয়ে চেয়ে রইল হরগোবিন্দর মুখের দিকে,

কিছুক্ষণ পর বলল - আশ্চর্য কথা বলেন তো দেখি, যখন শুয়ে ঘুমাই তখন শরীর থাকে সোজা আর যখন দাঁড়িয়ে ঘুমাই তখনও শরীর থাকে সোজা, খালি দাঁড়িয়ে ঘুমালে পায়ের উপর চাপ পড়ে বেশি আর শুয়ে ঘুমালে চাপ বেশি পড়ে পিঠের উপর, এই যা তফাত।
সব শুনে হরগোবিন্দর মনে হল সে বোধ হয় ভাল ভাবেই বুঝেছে ব্যাপারটা , ভেতর থেকে বেশ হালকা হালকা একটা ভাব পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনেই উঠে পড়ে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করল সে, কিছুদুর গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল , ভেতরে কেমন যেন একটা চাপ আবার শুরু হচ্ছে, পেটের ভেতরে এই যেটা হচ্ছে, ঠিক আভাস দিচ্ছে চিন্তাটা পুরোপুরি মিটল না, চিন্তার জের যেন রয়েই গেল। কিন্তু আবার তো ফিরে যাওয়া যাবে না, অগত্যা ভারি মন নিয়েই বাড়ি ফিরে চলল হরগোবিন্দ। তারপর দুদিন নাকি শয্যাশায়ী হয়ে ছিল , ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেয়ে এখন কিছুটা ভাল আছে।

(৯)

ননীগোপাল ম্যাট্রিক পাশ করেছে তা প্রায় কুড়ি বছর হল, বাড়ির চাষবাস নিয়ে এখন দিন কাটে। স্কুলে থাকতে যেদিন প্রথম শুনেছিল গাছেরও নাকি প্রাণ আছে, সেদিন থেকেই বিষয়টার উপর একটা বিশেষ কৌতুহল তৈরি হয় মনে। এখন ওই ব্যাপারটা বেশ কাজে লেগেছে ননীগোপালের। কাউকে না পেলেও গাছগাছালীর সাথে কথা বলে দিব্যি সময় কেটে যায়। অনেক বছর কথা বলে ননীগোপালের ধারণা জন্মেছে গাছেরাও উত্তর দেয়, তবে সেটা খুব মন দিয়ে লক্ষ করলে আর বহুদিনের অভ্যেস থাকলে তবেই বোঝা সম্ভব হয়, যেমন মাঝে মধ্যেই ননীগোপাল ওদের কথা ঠিক ধরে ফেলে কখনও পাতা কখনও ডালের নড়াচড়া দেখে। মিথ্যে কথা যে ওরা বলে না এমন নয়, তবে সাধারণত স্বার্থ না থাকায় বেশিরভাগ সময় সত্যি কথাই বলে থাকে। যেবার সুনীল কাকু কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কি একটা কাজে লাগিয়ে দেবে বলেছিল, বাড়ির লোকজন সবাই রাজি, কিন্তু বাধ সাধল ওই পুরনো আমগাছটা, কিছুতেই যেতে দিল না, যতই ননীগোপাল বোঝায় না কেন কিছুতেই রাজি হল না। সেই এক গোঁ নিয়ে রইল, শেষে সুনীল কাকুকে মানা করে দিতে হল। আহ্লাদী নামের গরুটাকে যেবার বেচে দিতে হল অভাবে পড়ে, কেঁদে কেঁদে একাকার হয়ে গেছিল, সেবারেও তো ওই শেগুন আর আমড়া গাছদুটো মিলে কত চেষ্টা করে শান্ত করল ওকে। কদিন আগে পাশের বাড়ির জ্যাঠার ভাগ্নে বেড়াতে এসে কথায় কথায় কি অপমানটাই না করে গেল ননীগোপালকে। ও নাকি পড়াশোনা করে আজ ভাল চাকরি পেয়ে সংসারের মুখ উজ্জ্বল

করেছে, ননীগোপাল সেরকম করতে পারেনি বলে কত কথাই না শুনিয়ে গেল ননীগোপালকে। সেদিন থেকেই ননীগোপালের মন মেজাজ বিগড়ে আছে, কারোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, মনটা একেবারে ভেঙে গেছে ওর। আজকে সকালে হারু জ্যাঠার মুখে শুনতে পেল কিসব নাকি আয়কর না কোন সরকারী দপ্তরের লোক এসে ওকে ধরে নিয়ে গেছে ভুল কাজ করার জন্য। সেটা নিয়েই কথা হচ্ছিল গাছেদের সাথে ননীগোপালের, বুড়ো অশ্বত্থ গাছটা বলল - এই যে কথায় কথায় আমি এটা করতে নেই ওটা করতে নেই বলি, অভিজ্ঞতা কি কম হল আমার। আর তাতেই তো তুই ঠিকঠাক আছিস, এই বিদ্যে যদি ওর জানা থাকত তবে কোন ভুল কাজ, কোন অন্যায় কাজ কি করতে পারত।

পলাশ গাছটা বলল - এসব কি ছাই আর কেউ শিখেছে, সবাই তো আর পারেনা শিখতে। তুই পারিস বলেই তো সব সময় উচিত কাজটাই করতে পারছিস, চলতে ফিরতে সবসময় আমাদের নজরে রয়েছিস।

শিমুল গাছটা বলল - ওই অল্প শিখেই যে সবাই সবজান্তা হয়ে যাচ্ছে ওতেই যত গোলমাল। একবার শিক্ষিত নাম হয়ে গেলে শেখার ইচ্ছেটাই চলে যায়। কারো কথা শুনতে তখন বড় আপত্তি, তাও আবার যদি বলার লোকটা ওর মত শিক্ষিত না হয় তবে তো আর বলতে নেই, কিছু কানেই যাবে না। তুই বরং ভালোই আছিস বুঝলি রে, অত শিক্ষিত হোসনি। ওতেই তোর মঙ্গল হয়েছে।

গাছেদের সাথে কথা বলে মনটা অনেকটা শান্ত হল ননীগোপালের। এক পরম শান্তি, এক পরম আনন্দে মনটা ভরে গেল।

(১০)

গ্রামের সাতখানা তেলেভাজার দোকানের প্রত্যেকটিতে বিকেলে একবার করে বসে কিছু না খেলে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয় নবীন চাটুজ্যে মশাই-এর, বয়স সত্তরের কাছাকাছি হলেও এখনও রোজ গন্ডা খানেক তেলেভাজা অনায়াসে খেতে পারেন। দোকান সংখ্যা বাড়লে ওনার কর্তব্যও বেড়ে যায়। ইদানিং যে সমস্যাটা ওনার শুরু হয়েছে সেটা হল কোন দোকানে খেলেন আর কোন দোকানে খেলেন না তা একটু গন্ডগোল পেকে যাচ্ছে। তাই প্রত্যেক দোকানে ঢুকে আগেই জিজ্ঞেস করে নিচ্ছেন - আমি কি আজকে এখানে খেয়ে গেছি? বেশি বিক্রি বাটরা না হলে কেউ কেউ তো দুবার করেও খাইয়ে দিচ্ছে। তাতে নবীন চাটুজ্যের

অসুবিধা নেই, অসুবিধা হয় যখন কোন দোকান বাদ পড়ে যায়। এই যেমন সেদিন শিবু পালের দোকানে ঢুকতেই শিবু পাল বলে উঠল - কি ব্যাপার চাটুজ্যে মশাই, শরীর-টরির ভালো তো, দু দিন এলেন না যে!
কি সর্বনেশে কথা, দু দিন দিব্বি আর সব দোকানে ঘুরে বেড়ালেও এই দোকান আসা হল না!
অগত্যা বলতেই হল - তবে আজ ওই দু দিনেরটাও দিয়ে দিস।
পাশের থেকে কে যেন অচেনা মত একজন বলে উঠল - শুনছি নাকি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগলে বেসনের বড় অভাব হয়ে যাবে, তা তখন তেলেভাজা বানাবে কি দিয়ে?
একি অলুক্ষণে কথা, চমকে উঠল নবীন চাটুজ্যে।
- ওরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি হে ?
- তা আমি ভবঘুরে মানুষ, চারদিকে যা দেখছি তাতে লক্ষণ ভালো ঠেকছে না, চারদিকে কেমন যুদ্ধ যুদ্ধ গন্ধ।
- কি রকম, কি রকম ?
আরো একটু ভয় পেল নবীন চাটুজ্যে।

- তা ধরুন, ছেলে মেয়েরা ছ্যাঁড়া জামা প্যান্ট পরা এখন থেকেই শুরু করেছে, দাঁড়ি কাটাও ছেড়ে দিচ্ছে, কান দুটো সব সময় বন্ধ করে রেখেছে, দু চাকার গাড়িগুলো - ঠিক যেন যুদ্ধের জন্য তৈরি, তারপর ধরুন শরীরের চারপাশে জামা কাপড়ের খাঁজে খাঁজে কত কিছু মেশিন ভরা। সবকিছু মিলিয়ে দেখলে কেমন যেন একটা যুদ্ধ যুদ্ধ গন্ধ পাওয়া যায়।
নবীন চাটুজ্যে বললেন - কি জানি বাপু, তেলেভাজা ছাড়া বাকি আর কিছু গন্ধ আজকাল তেমন নাকে যায় না। তবে তুমি যা বললে, চিন্তার বিষয়ই বটে, বেসনের কমতি হলে চলবে কেমন করে!
দুদিন খুব চিন্তায় কাটানোর পর আজ সন্ধে বেলা নবীন চাটুজ্যের বাড়ির বারান্দায় সভা বসেছে, তারক মাষ্টার, হরগোবিন্দ থেকে শিবু পাল, মহেশ তাঁতী, নিলকান্ত, মুকুন্দ বাঁড়ুজ্জে, শরৎ মুখুজ্জে,হারু জ্যাঠা, শ্যামাপদ, নরহরি চাটুজ্যে, হরিহর মন্ডল গ্রামের মোটামুটি গণ্যমান্য অনেকেই উপস্থিত। আলোচনা শুরু হয়েছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা নিয়ে।

নবীন চাটুজ্যে হরগোবিন্দকে জিজ্ঞেস করল - কানাঘুষো শুনতে পাচ্ছি হরগোবিন্দ, তোমার নাকি চিন্তা নিয়ে বেশ একটা গন্ডগোল চলছে, তা এটাও তো একটা চিন্তার বিষয়ই হল, এ ব্যাপারে তুমি কি বল?

হরগোবিন্দ মাথা চুলকে বলতে লাগল - এ বড় গড়বড় কেস দেখতে পাচ্ছি, চিন্তার বিষয়ই বটে।

শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করল - বেসন যদি সেরকম কম পড়ার ভয় থেকেই থাকে তবে আমি কি এখন থেকেই দোকানে বেশি পরিমাণে কিনে মজুত করে রাখব?

মুকুন্দ বাঁড়ুজ্জে বলে উঠল - দিনের বেলা না হয় আমরা জেগেই থাকি, রাতের দিকে কদিন পাহারা বসিয়ে দেখা যেতে পারে কি?

হারু জ্যাঠা গলা চড়িয়ে বলে উঠল - তোমার যত উল্টো পাল্টা বুদ্ধি, এ কি পাশের গাঁয়ের সাথে ঝগড়া নাকি !

তারক মাষ্টার জানতে চাইল - আচ্ছা এখবর তো খবরের কাগজ বা টিভি তে পাওয়া যায়নি, তবে ওই যে লোকটা বলে গেল, ওর কথাই বা বিশ্বাস করতে হবে কেন?

হঠাৎ কোথা থেকে যদুনাথ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল - আচ্ছা ওই লোকটার কি কোঁকড়ানো চুল, ছিমছাম শরীর, গলায় কন্ঠি, গালে হালকা দাঁড়ি?

নবীন চাটুজ্যে হ্যাঁ - হ্যাঁ করে উঠতেই হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল যদুনাথ।

- আরে ও তো বিশু মামা, কি বলে তার কোন ঠিক নেই, বাড়িতেই ওর কথা কেউ শোনে না, এইতো পরশু আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। দুর দুর, তোমরা ওর কথায় ভয় পেলে, ছ্যা ছ্যা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর এক এক করে সবাই বাড়ি ফিরে যেতে লাগল আর বলতে লাগল - আমি তো আগেই জানতাম, ও নবীনের সবেতেই বড্ড বাড়াবাড়ি ।

(এইখানেই আপাতত থামলাম, পরে সুযোগ পেলে আবার ঝাঁপি খোলা যাবে)

সূচীপত্র

দুর্যোধন সিনড্রম

অরুনোদয় সিনহা

এই দুর্যোধন এক অত্যন্ত বাজে চরিত্রের লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু মহাভারতের এক জায়গায় সে এমন একখানি প্রশ্ন তুলেছে যে, তাকে একটা ছোট্ট ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে !

সেই যে, কৃষ্ণঠাকুর যুদ্ধ আটকানোর শেষ চেষ্টায় হস্তিনাপুরে যখন এলেন, তিনি দুর্যোধনের সাথেও মোলাকাত করতে গেলেন। কিন্তু কৃষ্ণঠাকুর কিছু বলার আগেই দুর্যোধন এক জব্বর কথা বলে বসলো !

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি:
জানামি অধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তহস্মি তথা করোমি ।।

সোজা বাংলায় বললে - ওহে, ধর্ম কি, অধর্ম কি, এসব আমি খুব ভালো করেই জানি (আমাকে এন্তার জ্ঞান দিতে এসো না!), কিন্তু কি করে জানি না, আমি কিছুতেই না ধর্মের রাস্তায় চলতে পারি, না অধর্মের রাস্তা থেকে ফিরে আসতে পারি। কি যেন একটা আমার মধ্যে কাজ করে, সব জানা থাকা সত্বেও কিছুতেই ধর্মের রাস্তায় চলতে পারি না। লোকে বলে - সবার হৃদয়ে নাকি তুমিই আছো, তাহলে আমার এরকম অভ্যাসটাও নিশ্চয়ই তোমারই কাজ ! তুমি যেমন করাচ্ছ, আমি তেমনই করছি ! (আমার কি দায়?)

যুক্তির প্যাঁচটা লক্ষ্য করুন !

এর উত্তরে কিছু বলা চলেনা, কৃষ্ণঠাকুরও তাঁর ট্রেডমার্ক মৃদু হাসি হেসে সেদিন বিদায় নিয়েছিলেন। পরের পরিণতি আমাদের জানা।

গপ্পোটা এখানেই শেষ - কিন্তু দুর্যোধনের ওই প্রথম প্রশ্নটা মাথায় ঘুরতে থাকে, ঘুরতেই থাকে। আমিও যে ঐ একই রকম চক্করে প্রায়ই ফেঁসে যাই - জানি কি করা উচিৎ, কোনটা ভালো, কিন্তু কেন যেন পারি না - বিশুদ্ধ দুর্যোধন সিনড্রোম !!

এই সিনড্রোমটা যে ভালো নয়, তাও জানি, কিন্তু আটকাতে পারিনা। কেন পারিনা, তাও জানিনা।
গবেট দুর্যোধন নিজের মত করে একটা লজিক দিয়ে বিবেকের দহন থেকে বাঁচলো বটে, কিন্তু সেই উদ্ভট লজিকের ঠেলায় আমরা মিস করে গেলাম এই সংকটে কৃষ্ণের মত একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির মতামত। দুর্যোধনকে তাই একটু ধন্যবাদ, আর খানিক তিরস্কার।

সমস্যাটার সমাধান কিন্তু তাতে আদৌ হলো না।

জানি কি করা উচিৎ, কোনটা ভালো, কিন্তু কেন যেন পারি না। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া খারাপ, জানি, কিন্তু তাও দিই, দিয়ে দুর্যোধনের মতো গবেট যুক্তি খাড়া করি - বাকি সবাই তো দিচ্ছে, তাছাড়া বাড়ির সামনে কলের কানেকশনটা এখনো দিলোনা, কি আর হবে ট্যাক্স দিয়ে? ঘুষ নেওয়া খারাপ, জানি, তাও নিই, আর গবেট যুক্তি বানাই - ও কটা টাকা দিলে ওর আর কি আসে যায়, আমার গোয়া বেড়ানোটা তো হয়ে যাবে।
অজস্র উদাহরণ, কটা বলবো ! জীবনের প্রতি পদে এই টানাপোড়েন চলছে - আস্তে আস্তে এমন মোটা চামড়ার হয়ে উঠি যে প্রশ্ন ওঠাটাও বন্ধ হয়ে যায়, পুরো নির্জীব যন্ত্রে পরিণত হই।

এটাই দুর্যোধন সিনড্রোম।

বাঁচার কি কোন উপায় নাই ?

খুঁজতে খুঁজতে পেলাম, আছে, বাঁচার উপায় আছে, মহাভারতেই, ওই কৃষ্ণঠাকুরই এই সংকট থেকে বেরোনোর উপায় বলেছেন উপরোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে, কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে দাঁড়িয়ে, অর্জুনকে।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন - ভালো কথা মেনে চলা বড়ো কঠিন, আমাদের মন সদাচঞ্চল, গোঁয়ার, অবাধ্য; প্রশ্ন করেছিলেন - বায়ুকে ধরা যেমন কঠিন, মনকে বশে আনাও কি তেমনই কঠিন নয় ?

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই পর্যবেক্ষণকে পুরোপুরি সমর্থন করেছিলেন, তারপরই দিয়েছিলেন সেই মহৌষধ - অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যাতে।

কুন্তিপুত্র, একমাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্য দিয়েই এই সদাচঞ্চল মনকে বশে আনা যায়।

কিসের অভ্যাস ? বৈরাগ্যই বা কি ?

অভ্যেসটা মনের। কিরকম সেটা বরং উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক।

ঘরের যত প্লাস্টিক প্যাকেট আমি সাধারণত বাড়ির পাশের জলা জমিটাতেই ফেলি। একশো মিটার দূরে একটা ভ্যাট আছে, সেখানে ফেললে করপোরেশনের রিসাইকেল ভ্যান এসে প্লাস্টিক গুলো নিয়েও যায়, কিন্তু ওই আর কি - রোজ রোজ অতোটা যাওয়া !

এইটা দুর্যোধন সিনড্রোমের সূত্রপাত।

আমি ভালোমতই জানি জলাজায়গায় প্লাস্টিক স্তূপ জমার কুপ্রভাব, এবং আমার কি করণীয়, কিন্তু এক অদ্ভুত যুক্তিহীন আলস্য আমাকে আটকে দিচ্ছে! কেউ যদি ভ্যাটে ফেলার কথা আমাকে বোঝাতে আসেন, আমি হাজার যুক্তি খাড়া করি - সময় নেই, যাবো কখন, সরকার আমার বাড়ির পাশে ভ্যাট বসায়নি কেন ... অথচ এর কোন যুক্তিই যে আমার যুক্তিহীন আলস্যের ভিত্তি হতে পারেনা, আমার থেকে ভালো সেটা আর কেউ বোঝেনা।

যদি ভাবি একটু খুঁটিয়ে, তাহলে দেখবো - এই অলসতা কিন্তু আমার মনের। কাজেই কাটাতে হলে, মনকে একটা দাওয়াই দিতে হবে।

কি দাওয়াই ?

স্পষ্ট, সুস্পষ্ট নির্দেশ। কিরকম ?

আমি জোরে জোরে উচ্চারণ করবো - আজকে আমি ভ্যাটে প্লাস্টিক ফেলতে যাবো, যাই হোক না কেন।
ব্যাপারটা একটু নাটকীয় হয়ে যাবেনা ? পরিবারের লোক, প্রতিবেশীরা শুনে হাসবে না ? বেশ তো, একটু আড়াল খুঁজে, নির্জনে বলি। দেখবো, এরকম সুস্পষ্ট নির্দেশে কিন্তু ওই যুক্তিহীন অলসতা ধীরে ধীরে কমে আসে। একবার বললে যদি কাজ না হয়, দু, তিন, পাঁচ বার বলি। কয়েকবার জোরে বলি, তারপর মনে মনে ক্রমাগত বলতে থাকি দুএক মিনিট।

জড়তা কাটবে, জোরটা ফিরে পাবো ।

এটাই অভ্যেস।

যে কাজে জড়তা আসবে, অথচ মনে জানি সেটা করা "উচিৎ", মনকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেবো, দিতেই থাকবো যতক্ষণ না কাজটা হয়।

এই অভ্যাস চালিয়ে যাবো,কিছুদিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে বুঝতে পারবো মন বাগে আসছে, আগে যেখানে পাঁচবার বলতে হতো, এখন একবার বললেই হচ্ছে, বা আদৌ জোরে বলতে হচ্ছে না, মনে মনে বললেই কাজ হচ্ছে।
ধীরে ধীরে এমন অবস্থায় পৌঁছে যাবো যে উচিৎ পথে চলার অভ্যেসই হয়ে যাবে মনের।

এই হলো অভ্যাস।

বৈরাগ্য হলো সবরকমের প্রলোভনের জিনিস থেকে জোর করে মন ফিরিয়ে নেওয়া।
পেট খারাপ, তাও চানাচুর খেতে প্রচন্ড ইচ্ছে করছে - চলবে না। স্যামসাংএর টপ মডেলের ফোনটা আছে, সব কাজ খুব সুন্দর চলে যাচ্ছে তাও আইফোন কিনবো - চলবে না, মনের দিক ফেরাবো। এসউভি আছে, তবু জাগুয়ার না হলে মন খারাপ - চলবে না, মনকে প্রবল শাসন করতেই হবে।
মোদ্দা কথা, আমার প্রয়োজন (need) যতটুকু, ততটুকুই, বেলাগাম চাহিদাগুলোকে (want) একদম পাত্তা দেওয়া চলবেনা। এটাই বৈরাগ্যের অভ্যাস।
কিন্তু, তাহলে - সখ আহ্লাদ মেটাবো না ? মেটাবো, ঐ যে - need অব্দি মেটাবো, want-এর দুনিয়াতে প্রবেশ করা চলবে না, আর্থিক সক্ষমতা থাকলেও না!
এটিই বৈরাগ্য, গেরুয়া পরে লোটা কমন্ডলু নিয়ে হরিদ্বার যাওয়া নয়।

আর এসব যদি না করতে পারি ? প্রথম দিনে সত্যিই একশভাগ করতে পারবো না, কিন্তু রোজ একটু একটু করে বাড়াতে তো পারি। ৯৮ ভাগ ব্যর্থতা মানে কিন্তু ২ ভাগ সফলতা!

আর পারলেই, মনকে একটু পুরস্কার দিন!

শুধুই তিরস্কার করে গেলে জগতে সবাই বিগড়ে যায়, মন কোন ছাড়। তাই যখনই দেখবেন, বৈরাগ্য অভ্যাসের কোন একটি ধাপে মন ঠিকঠাক তা করতে পেরেছে, তাকে ছোট্ট পুরস্কার দিন - কিভাবে ?
সে যা চায়, সেটা খুব অল্প পরিমাণে তাকে করতে দিন।

কিরকম ?

আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন একমাস তেলে-ভাজা খাবেন না, আপনার কোলেস্টেরল লেভেলের পক্ষে সেটা মোটেই ভালো নয়, এবং মনের সাথে অবিরাম যুদ্ধ করে একমাস তেলেভাজা না খেয়ে থেকেছেনও - এবারে একদিন মন যদি চায় কাটলেট খেতে, খান, এবং পরবর্তী লক্ষ্য স্থির করুন আগামী ছমাসের জন্যে! পরের ধাপে হয়ত আট মাস।

এইভাবে ক্রমাগত শাসন ও পুরস্কারের মধ্যে দিয়ে চলুক যাত্রা।

শেষমেষ দেখতে গেলে, মনই আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, সংযত তাকে তো অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু সে প্রক্রিয়ার ফলে সে যেন আপনার শত্রুতে পরিণত না হয়, সেটাও দেখতে হবে বইকি।

সূচীপত্র

মূর্তিপূজা

অরুনোদয় সিনহা

পড়ার থেকে শোনা ভালো, শোনার থেকে দেখা ভালো - যেকোন বিষয় শিখতে গেলে এটি এক মোক্ষম সত্য। দেখে-শুনে, হাতে কলমে করে শেখার সুযোগ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে খানিক পাওয়া যায়, কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে পুঁথিগত বিদ্যাই আমাদের একমাত্র ভরসা - বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পড়াশোনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দিবাস্বপ্ন।

পরীক্ষায় নম্বরের দায়ে, ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা, সংস্কৃত আমরা প্রাণপণে, ঘাড় গুঁজে মুখস্ত করে যাই, এবং যেদিন প্রথম সুযোগ আসে সেদিনই তাদের থেকে দূরে পালাই! অথচ কত সুন্দর হতো না যদি ওই শিক্ষাগুলি আমরা আমাদের জীবনের প্রাত্যহিকতার সাথে মিলিয়ে পড়তে পারতাম ? ফ্ল্যাটের দু-কামরার বদ্ধ ঘরে বসে মাথায় কোন ধারনাই আসে না কোথায় বিজয়নগর সাম্রাজ্য, কিই বা তার মূল্য, কেনই বা সে থাকলো না ! অথচ একবার যদি গিয়ে দাঁড়াতাম তুঙ্গভদ্রা নদীর ধীরে, হাম্পির ধ্বংসস্তুপে ? আর কেউ একজন বলে যেতেন ধীরে ধীরে সে ইতিহাস - প্রতিটা পাথর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ? সারা জীবনেও কি আর সে জিনিস "মুখস্ত" করার দরকার পড়ত আদৌ ?

রাত জেগে মুখস্ত করে যাই মহারাষ্ট্রের তুলো, লাল মৃত্তিকা আর শিল্পনগরীর কথা - আর ভেতরে ভেতরে বিরক্তিতে ছটফট করি - অথচ একবার যদি রেলগাড়িতে চেপে সারাদিন ধরে পেরিয়ে যাই সে বিস্তীর্ণ মালভূমি, চিনি জানি সেখানকার মানুষদের খানিক হলেও - পড়া শুধু আর পড়া থাকবে না, সে আমারই জীবন হয়ে উঠবে।

বলতে পারেন, বড্ড আদর্শবাদী কথা হয়ে যাচ্ছে - অত সময়, অর্থ, সুযোগ কোথায় প্রতিটি জিনিস ছুঁয়ে, দেখে, স্পর্শ করে অনুভব করার ? ঠিক, সাধ আর সাধ্যের মধ্যে ফারাক সবসময়ই থাকে - কিন্তু তাই বলে যতটুকু সাধ্য আছে, সেইমত সাধপূরণও কি করব না ? আসল ব্যাপার তো এই মূল্যটি বোঝা যে - পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে হাতে-কলমে শেখা অনেক বেশি ফলপ্রসু - তাই নয় কি ? তাহলে আমার যা সাধ্য, তার মধ্যে যতদুর পারি হাতে কলমে শিখি না কেন ?

মুর্তিপুজাও ঠিক এইরকম ।

আমরা জানি জীবনে কতকগুলো সৎ আদর্শ মেনে চলা উচিত, মনের ভালো গুণগুলির চর্চা করা উচিত, মন:সংযোগ ক্ষমতা বাড়ানো উচিত - এ সম্বন্ধে নানা বই পড়ি, সোশ্যাল মিডিয়াতে রোজ মেসেজও পাই - কিন্তু ... সবটাই তো পুঁথিগত বিদ্যা - হাতে কলমে কি করি ? আরো মুস্কিল - মহাপুরুষেরা সব "ছিলেন', পাস্ট টেন্স, এখন সামনে কেউ নেই - তাঁদের যত কথা সেসবও ওই একই - 'পুঁথিগত' । করণীয় তাহলে কি ?

এই জন্যেই মূর্তি ও পুজোর ধারণার উদ্ভব - আপনি হাতে কলমে যাতে আপনার আদর্শ অভ্যাস করতে পারেন। মূর্তি বলতে আমি শুধু মাটির প্রতিমার কথা বলছি না - মাটি, পাথর, ফাইবার, মোম, কাগজ - সবই হতে পারে, মেটেরিয়ালটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো - কার মূর্তি, কিরকম দেখতে মূর্তি, আমি যে আদর্শের চর্চা করতে চাইছি তার সাথে সেই মূর্তির রূপ খাপ খায় কি না।

আপনি যদি নির্লোভ, সংযমী হওয়া অভ্যাস করতে চান, অবশ্যই তাহলে রাবণের মূর্তিকে পুজো করা আপনার উচিত নয়। উল্টোটাও সত্যি - আপনি যদি চান অত্যাচারী, হিংস্র হয়ে উঠতে, মনকে সেরকম ভাবে তৈরী করতে, আপনাকে অবশ্যই কংস, হিটলার, তৈমুরলঙ্গের পুজো করতে হবে। কাজেই, আপনি আপনার মনের কোন কোন গুণগুলির অভ্যাস করতে চান, সেইমত আপনাকে আপনার আদর্শ ঠিক করতে হবে, ও সেই আদর্শের মূর্তিকে পুজো করতে হবে, রোজ, অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে।

কিন্তু, মনের মধ্যে একটা খচখচ করে - আধুনিক যুগের যুক্তিবাদী মানুষ আমি, সেই আদ্যিকালের পুজো-আচ্চা - ফুল, কাঁসর, প্রসাদ - একদম ভেতর থেকে ঠিক আসে না, কি করে পুজো করবো? খুব সোজা - পুজো পদ্ধতির যে মূলভাব, স্পিরিট, সেটাকে ধরুন - আনুষঙ্গিক বাহুল্যগুলো বাদ দিন।

একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, আপনি চাইছেন আপনার সকলকে সমানভাবে দেখার ক্ষমতা যেন বাড়ে; পদ, বয়স, জাতি, সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে আমরা সাধারণতঃ যে সকল ভেদাভেদ করে থাকি - সেগুলো যেন আপনার মন থেকে ধীরে ধীরে সরে যায়, সবাইকার সাথে যেন আপনি সমান সম্মানের সাথে ব্যবহার করতে পারেন।

এটি কিন্তু একটি মানসিক পরিবর্তন যা আপনাকে নিজের মধ্যে আনতে হবে। আপনি যদি এমন কোন আদর্শ ব্যক্তির মূর্তি বা ফটো সবসময় রাখেন আপনার সামনে, রোজ নিয়ম করে সেই ব্যক্তির ব্যবহার ও জীবন চিন্তা করেন - এই অভ্যাস করা ও আপনার সংকল্পের দৃঢ়তা বজায় রাখা আপনার জন্যে অতি সহজ হয়ে যাবে।

কে হতে পারেন সেই ব্যক্তি ?

আমার মাথায় চট করে আসছে শ্রীচৈতন্যদেবের নাম - যিনি সব জাতপাত, কৃত্রিম সামাজিকতা ভেঙ্গে দিয়ে সমদর্শিতার আদর্শকে সর্বোচ্চ স্থানে বসিয়েছিলেন।
আপনি শ্রীচৈতন্যদেবের একটি ফটো বা প্রতিমা জোগাড় করুন - ঘরের একটি শান্ত স্থানে, সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখুন, রোজ নিয়ম করে সে ফটোর দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করুন যেন আপনার মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের মত সমদর্শিতার আদর্শ জেগে ওঠে।

এই তো মূর্তি পুজোর মূলভাব।

এই মূলধারা অনুসরণ করে আপনি মনের যে যে ভাবের উন্নতি করতে চান, সেই সেই ভাবের অনুসারী আদর্শপুরুষ চিহ্নিত করুন, তাঁর একটি প্রতিমূর্তি সবসময়ে চোখের সামনে রাখুন, নিয়মিতভাবে সে প্রতিমূর্তির সামনে প্রার্থনা করুন, শান্ত হয়ে বসে প্রার্থনা করুন।
বলতে পারেন - শুধু এই পুজো-প্রার্থনাতেই কি আমার মন পরিবর্তিত হয়ে যাবে ? আর কিছুটির দরকার নেই ? আদৌ নয়। পুজো প্রার্থনা একটি উপায়, খুব ফলদায়ক উপায় - কিন্তু একমাত্র উপায় নয়। বাকি আনুষঙ্গিক ব্যবহারিক অভ্যেস, যা আপনি করবেন বলে স্থির করেছেন, সেসব আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। পুজো-প্রার্থনা আপনাকে রোজ সুযোগ করে দেবে ধীর-স্থির ভাবে চিন্তা করার - আপনি কতদূর এগোলেন, কোথায় আটকাচ্ছে, কিভাবে সে বাধা পেরিয়ে বেরোবেন।
যখন এই চিন্তাগুলি করছেন - তাকিয়ে দেখুন আপনার আদর্শ পুরুষের দিকে, চিন্তা করুন কিভাবে তিনি তাঁর জীবনে ঐ একইরকম বাধা অতিক্রম করেছেন - অনুপ্রেরণা পাবেন, সাহস পাবেন, শক্তি পাবেন।

মানবাত্মার এই অভী: অভিযানে সহায়তা প্রদানই মুর্তিপুজোর পরম সার্থকতা।

সূচীপত্র

পরিব্যক্ত বাঙালী

চন্দন মাইতি

বুড়ো আঙুলটা রেখে, একটা গোলা আঁকুন। মুখটা যদি, ওই বৃত্তের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়, ৯০ শতাংশ, ওটাই বাঙালির মুখ। হাঃ হাঃ, এটা এক অবাঙালি বন্ধুর অভিমত- বাঙালি চেনার সহজতম উপায়।
জীবনধারণ আর চাকরির তাড়ায়, শিকড়হীন লোকগুলোর জায়গা হয়েছে মেট্রোপলিটনের ছোট ছোট ফ্ল্যাটে। কোথাও ভাড়াটে, সাকুল্যে কারো কারো নিজের আস্তানা। বাঙালিরাও এর বাইরে নয়, বরং, একটু সুস্পষ্ট ভাবেই অস্তিত্ব আছে নিজেদের কিছু স্বাভাবিক, স্বাবলম্বী পরিচয় নিয়ে।

দা ফ্ল্যাশবাক:

বাঙালিরা যেখানেই যাক, একটু থিতু হহলেই বাঙালিয়ানাটা বেরোতে শুরু করে। যেমন? সন্ধ্যে বেলাতে একটু চা, মিউজিক প্লেয়ার এ একটু চড়া সুরে রবীন্দ্র সংগীত। বউ না থাকলে একটু বিয়ার বা হুইস্কির চুমুক। রবিবারের দুপুরে চিকেনের পর একটা ভাত ঘুমের পর, একটু ডিবেট। তর্কে বাঙালিকে হারানো বেশ চাপের ব্যাপার। যুক্তির থেকেও গলার আওয়াজটা বেশ জোরেই থাকে।

ইলিশ মাছ ছাড়া বাঙালি! ইম্পসিবল। যারা খায়না, এখনো, চুপি চুপি বলে, যেন সাংঘাতিক অপরাধ! আর এতো তেল যাবে কোথায়? চল্লিশ পেরোলেই সুগার বা এসিড।

উপস্, ইনটেলেকচুয়াল প্রমাণের সব থেকে বড় হাতিয়ার হলো বই। ঘরের ভিতরে বইগুলো পরিপাটি করে সাজানো থাকবে, বুকসেল্ফে বা ক্যাবিনেটে, একটা লাইব্রেরি টাইপের ফিলিং দেওয়ার চেষ্টা, যেন সাজানো আছে আপনারই জন্যে: আসুন, দেখুন - দূর থেকে।
কিন্তু হাতে নেওয়ার আগে জিজ্ঞেস করুন।

ও, হার্ড কভার এর বইগুলো চাই ফ্রন্ট সিরিজে যেমন ধরুন বঙ্কিম বা সুনীল সমগ্র;বাণী বসু বা তসলিমা না থাকলে আবার লোকে নারীবিরোধী ভাবতে পারে, তাই ওগুলোও চাই।একটু আধটু নতুন লেখক না থাকলে আবার লোকেরা ব্যাকডেটেড ভাবতে পারে, তাই নিয়ম করে বইমেলা যেতে হবে, অনেক ডিসকাউন্ট-ও পাওয়া যায়।

হার্ড-কভার না হলে আবার এলাইনে রাখা বেশ মুশকিল, ওটা একটা স্যালিয়েন্ট ফিচার ! সবথেকে প্রব্লেমেটিক হলো ওই ওষুধ এর বোতলগুলো। কোথাও একটা পার্মানেন্ট প্লেস পাওয়া যায় না, ঘুরিফিরিয়ে ডাইনিং টেবিলেই। ও! ডাইনিং টেবিল বলতে মনে এলো, এটা কিন্তু বাঙালিদের অনেক পুরোনো অভ্যেস। ডাইন করা ছাড়া ওই টেবিলে সব কিছু করা বা রাখা হতো।

জয়েন্ট বা ব্যাক পেইন এর জন্যে হয়তো আজকাল, টেবিলেই বসতে হয়, কিন্তু নীচে, মাটিতে বসে খাওয়াটায় বাঙালিরা বেশ গর্ব অনুভব করে, এখনো।

একটু ভালো করে দেখলে বুঝবেন, যতই কাবার্ড বা হ্যাংআর থাকুক, দরজার পিছনে হুক থাকবেই, অফিসে ফেরত জামা আর প্যান্ট লাগাতে, ওই আর কি।

সাধারণত, বাঙালির একটু বাতিক আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতে, ঘর না হলেও, বাথরুম, ওয়াশ রুম এ। এরপর, বারান্দায় একটু মিনি গার্ডেন। পারলে সব গাছই লাগিয়ে একটা বাগিচা বানাতে চায়, কিন্তু সার্বসাকুল্যে একটা বেলফুল, জবা বা টগরেই এসে থামে, আরো আলসিদের জন্যে মানি প্ল্যান্ট। গোলাপ, সাধারণত নিম্নবঙ্গের মাটিতে খুব একটা ভালো হয়না, আর অনেক আলো চাই।

দা ট্রানজিশন:

এই যে সাতকাহন কথা হলো, এটা খুব নতুন নয়, এবং প্রায় সব পরবাসী বাঙালিরা অনুভব করেছে, করছে। তাতে কি হলো? আমরা দেশ বদলাচ্ছি, বেশও বদলাচ্ছি।

গ্লোবালাইজেশনের ভিড়ে আমরা মিশে যাচ্ছি বা সত্তাগুলো হারানোর চেষ্টায় ব্যাকুল। শান্তিনিকেতনি ব্যাগ ছেড়ে ব্যগপ্যাক। কম্ফোর্টেবল নাকি আপডেট? লুঙ্গি, পাজামা তো অনেক আগেই বিলুপ্ত। রবীন্দ্রসংগীত-এ বাস আসে না, ৫.১-এ উফারে হানি সিংই মানায়। মাছ-ভাতে অনেক ক্যালোরি, স্যালাড-ই ভালো। ইংলিশই আমাদের সংসার , সেটা গুগলই হোক বা হোয়াটসয়াপ! ছেলের প্রথম ভাষা ইংরেজি, দ্বিতীয় হলো জাতীয়।

বাংলা কোথাও নেই। একটু হলেও দুঃখ হয়, ওরা চাঁদমামা, আনন্দমেলা, দেশ, শরৎ, বঙ্কিম, সুকুমার, সুনীল, জয় গোস্বামী পড়বে না হয়তো হ্যারি পটার দিয়েই শৈশব কাটবে যেটা শুরু হয়েছে ঠাকুরমার ঝুলি দিয়ে নয়, ডোরেমন, সিনচন আর ইউ-টিউবে।

বিশ্ব-সমীকরণে মিশে যাচ্ছি, কিছুটা অজান্তে, কিছুটা স্বইচ্ছায় বা বাধ্যতায়। মাঝখান থেকে একটা স্বতন্ত্র জাতি নিজস্ব সত্তা গুলো হারাচ্ছে। ভালো খারাপ বা ঠিক-ভুল নির্ধারণ

নয়, মিলেনিয়াল জেনেরশন হয়ে, একটা অদ্ভুত ট্রানজিশন এর দর্শক হয়ে আছি। আর একটু একটু করে সময় টা চলে যাচ্ছে, রোজ। মাঝে মাঝে ফ্লাশবাকে পুরনো সময়টা দেখি, তারপর আবার বাগপ্যাক নিয়ে দৌড়-বহুজাতিক কোম্পানীর চার-বাই-চার কেবিনের দিকে।

দা হোপ:

তবে বস্, অতটা ভাববার কিছু নেই। এটাও একটা সাম্যাবস্থায় পৌঁছাবে, যাচ্ছেও। বাঙালি আর ঘরকুনো নেই, বিশ্বের প্রান্ত ঘুরছে। কেরিয়ার গাইডের জন্যে মামা কাকা নয়, নিজেই এক্সপেরিমেন্ট করছে জীবনের সাথে। ৬ সংখ্যার মাইনে ক্রস করছে জীবনের আধা রাস্তাতেই। নিজের বাসার জন্যে আর অপেক্ষা নয় জীবন শেষের গ্র্যাচুইটির উপর। নতুন নিজস্বতায় জাগছে বাঙালি। নতুন ছবি হচ্ছে। নতুন নভেল লিখছে। গান হচ্ছে আরো ধারালো, আরো বেশি জীবনমুখী। হতে পারে একটু ফিউশন, কিন্তু এটাও একটা নতুন শুরু। আর যাইহোক, আঁতেলবাজিটা বাঙালির গর্ব-ও বটে। বাংলা ছাড়লেও, বাংলাটা ভুলিনি।

একদিন ছাড়া ছাড়া ফোন আসে।
আগে এদিক থেকে যেত,এখন ওদিক - রাত দশটা থেকে সাড়ে-দশটার মধ্যে।
"বাপি, কেমন আছিস, সবাই ঠিক আছিস তো?" প্রশ্নটা একই থাকলেও,
উত্তরটা খুব একঘেয়ে হয়ে গেছে, পাল্টানোর বৃথা চেষ্টা, মাঝে মধ্যে।
প্রশ্নগুলোর পিছনের অকুলতাটা কিন্তু একই আছে - গত কয়েক শতাব্দী ধরে।
দম বন্ধ কান্নার কাঁটাটাকে আপন করে নিয়েছি জীবনের সাথে, প্রাত্যহিক কাজের মতো
আজকাল আর তেমন কষ্ট হয়না।
খালি একটু ভয় হয় আজকাল মাঝে-মধ্যে
হঠাৎ যদি ফোন আসাটা বন্ধ হয়ে যায় দুম করে?
এইটা ভেবে, ফোন লাগাই। ছ'টা রিং-এর পরে ফোন ওঠে। কে? বাবু? হ্যালো কে?
ভাইটাও তো বাইরে, বহুদিন।
নিথর আমার আমি থেকে আওয়াজ আসে না।
মিনি-র ড্রাইভারের পিছনের সিটে বসে, লুকিয়ে একটু কেঁদে নিই। চুপ করে।
কেউ আবার দেখে না ফেলে।

সূচীপত্র

মৃত্যু

অভিষেক চক্রবর্তী

আস্তে আস্তে জলের বিন্দুটা বড় হচ্ছে আর যখন নিজের ভার নিজে নিতে পারছেনা তখন টপ করে নিচে পড়ছে - সেটাই এক দৃষ্টে দেখছিলাম বসে বসে সামনের একটা গাছের পাতার দিকে তাকিয়ে।

বৃষ্টির পর স্বচ্ছ একটা হাওয়া মনটাকে বেশ হালকা করে দিচ্ছিল| ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত বারোটা বাজে - নাঃ, আজ আর পড়তে ইচ্ছে করছেনা, শুয়ে পড়লাম ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের বইটার ওপর তোয়ালে জড়িয়ে।

সাল ২০০৩, জুন মাস, দিন কুড়ি হয়েছে, এরকম ভাবেই রাতের পর রাত বোকারো হাসপাতালে কাটছে আমার। বাবা নিউরো আইসিইউতে, মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করছে মারাত্মক স্কুটার দুর্ঘটনার পর, আর আমার আর পরিবারের আশায় আশায় প্রতিদিন কাটছে যে, এই বুঝি বাবা কোমা থেকে বেরোবে আজ।

রাতে হসপিটালে থাকতাম আমি আর দিনে মা আর বোন। সামনেই ইঞ্জিনিয়ারিং সেমেস্টার পরীক্ষা, তাই ওখানেই যা একটু পড়ার পরতাম। সেদিন আর পড়তে ইচ্ছে করল না, তাই বইটা বালিশ করে নিলাম।

বোধহয় দু তিন ঘণ্টা হয়েছে, দূর থেকে কে যেন একটা নাম নিয়ে ডাকছে মনে হল। রাতের বেলা কেউ তার আত্মীয়ের নাম ডাকাটাকে খুব ভাল ভাবে নিত না ওখানে। রুগীর নাম ধরে আত্মীয়কে ডাকা মানেই কোন বড় দুঃসংবাদ আছে। কোনদিন নাম ধরে ডাকা হতো, কোনদিন বা রুগীর বেড নম্বর ধরে। ৭ নম্বর বেড আর তপনকুমার চক্রবর্তীর বাড়ির লোক - এই দুটো ছিল রাতের বেলা আমার পরিচয় !

টি কে চক্রবর্তী, টি কে চক্রবর্তী - অনেক দুর থেকে কেউ যেন নামটা ডাকছে..ধড়মড় করে উঠলাম...ঘুম তো এমনিতেই পাতলা হতো...তার ওপর সব সময় একটা ডাক শোনার একটা ভয়...উঠে বসতেই কেমন যেন হাত পা কাঁপছে , ঘামতে শুরু করেছি, হৃদপিন্ড রীতিমতো ধাক্কা মারছে, আর ঘুম.....এবারে পরিস্কার শুনছি - "বি কে চতুর্বেদী, বি কে চতুর্বেদী কা ঘর কা কোই হ্যায় কেয়া'...উফফ.. ধড়ে প্রাণ ফিরে এল, ঘুমের ঘোরে ভুল শুনছিলাম এতক্ষন। আর তো ঘুম আসবেনা, কিন্তু একটা অদ্ভুত ভাবে যেন মনে হচ্ছিল, আমিই যেন মরতে মরতে বেঁচে গেলাম। ঘুম গেল কিন্তু শান্তি এল। পাতায় জল পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে।

আরো পাঁচ দিন গেল, বাবার কোন উন্নতি নেই। সেদিন রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম, সারা দিনের শ্রমে খুব ক্লান্ত.. হঠাৎ শুনছি আবার কেউ ডাক দিচ্ছে..."৭ নাম্বার, ৭ নাম্বার বেড কা কোই হায় কেয়া"...আবার ধড়ফড় করে উঠে বসলাম...এ কি শুনছি...৭ নম্বর তো আমার বাবার বেড...তাহলে কি?? শরীরটা এক মুহূর্তে ঠান্ডা হয়ে গেল...মাথাটা কেমন ভীষণ ভারী লাগতে শুরু করল...এমন সময় পাশের লোকটা হাত তুলে বলল..."হা জি, ইধর হু' , তখন মাথায় এল, দীর্ঘ দিন বাদে বাবাকে গতকাল সকালেই ৪ নম্বর বেডে সরানো হয়েছে...

আবার আমি বেঁচে গেলাম।
আবার একটা উইলসফ্লেক...

এবারের ঘটনাটা আরেকটু মর্মান্তিক, ভয়ংকর। সেদিন কিছুতেই ঘুম আসছিলোনা। হসপিটালে সেটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন। আমি আর আমার জেঠু ছিলাম সেদিন রাতে। রাত প্রায় দুটো। হঠাৎ এক মহিলার আর্তনাদ, দূরে...সেই শব্দ আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। পুরো হসপিটালে ওই শব্দটা যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমি আর জেঠু দুজনেই দৌড় দিলাম শব্দ লক্ষ্য করে...যত কাছে এগোচ্ছি, ততই সেই আর্তনাদের তীক্ষ্নতা কানকে ঝালা পালা করে দিচ্ছে। সামনে যেতে দেখি, সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। এক মধ্যবয়সী মহিলা তার তিন-চার বছরের ছেলের নিথর নীল দেহকে কোলে নিয়ে মাটিতে বসে উন্মাদের মতন কাঁদছে। ওই আর্তনাদ হসপিটালের সমস্ত প্রান্তে সেদিন গেছিল কিনা জানিনা, কিন্তু আমি একজন মাকে তার শিশুর বিষক্রিয়ার মৃত্যুকে মেনে না নিতে পারার যন্ত্রণাতে কাতরাতে দেখেছিলাম। সেদিন একটুর জন্য হলেও আমার নিজের কষ্টটাকে খুব ম্লান লাগছিল। সেদিন মনে হচ্ছিল মৃত্যু নিয়ে যদি বিনিময়প্রথা শুরু করা যায়।
আমার বাবা কোমা থেকে ঠিক তিরিশ দিন বাদে বেরিয়ে আসেন।
কিন্তু আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্যটা অন্য। এবার সেটাই বলি। আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে, তার সবটাই খারাপ নয়। আমার বাবার এক্সিডেন্টটা আমাদের জীবনে একটা কালো অধ্যায়। কিন্তু ওই যে রাতগুলো আর দিন গুলো আমি কাটিয়ে ছিলাম তাতে আমার জীবন দর্শনই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আমি মৃত্যুকে প্রতিদিন খুব কাছে থেকে উপলব্ধি করেছি, তার গন্ধ পেয়েছি, তাকে ভয় পেয়েছি, তাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছি। আবার বা কখনো আবাহনও জানিয়েছি তাকে, যখন দেখেছি কেউ বেঁচে থেকে মৃত্যুকে প্রতিনিয়ত আসতে বলছে - সে

আরো ভয়ানক। আমাদের জীবনের সত্যিটা ফেসবুক, ইন্স্টাগ্রামে কতটা আছে জানিনা, কিন্তু একটা রাত হসপিটাল বা কিছু ঘণ্টা একটা শ্মশানে থাকলে আমার মনে হয় জীবনের মর্ম আর সত্যিটাকে অনেক কাছ থেকে দেখা যায়।

আমার লেখাটা হয়ত একটু ভারী প্রকৃতির, কিন্তু এই অভিজ্ঞতাটা না বললে হয়ত আমার কবিতার মানেটা আরো শক্ত হতো আপনাদের কাছে।

মৃত্যু ,
তুমি বেঁচে থাকো,
অকাল হয়ে নয়...

মৃত্যু,
তুমি চলেই এসো,
সময় যখন হয়...।

মৃত্যু,
তুমি বেঁচে থেকো,
সময়ের হাত ধরে...

মৃত্যু,
তুমি নিয়েই যেও,
শ্বাস কে বন্দি করে...।

মৃত্যু,
তুমি পরিবর্তন,
সর্বদা খারাপ নও...।

মৃত্যু,
তুমি প্রতিক্ষিত, যদি,
ঠিক সময়ে হও...।

মৃত্যু,
তুমিতো দেখি চরম ভীতু,
শুধুই অন্যের কাছে যাও...

মৃত্যু,
একদিন একটু সাহস করে,
নিজেকে দেখা দাও...

মৃত্যু,
তুমি কি শুধুই আলতা সিঁদুর,
ধূপকাঠি খই চন্দন?

একবার না হয় এসো দেখি,
নিজেই নিজের তর্পণ...

সময়

অভিষেক চক্রবর্তী

আমার মনে হয় আমরা কেউই একটা জিনিসকে কখনই সঠিকভাবে বুঝতে পারিনা - "সময়"। এই সময় জিনিসটাকে বোঝা আর তাকে সময়োপযোগী সম্মান দেওয়া, ভীষন কঠিন কাজ। "আজ ভাল তো কাল খারাপ' - বলা খুব সোজা, কিন্তু দীর্ঘদিন ভাল সময় খারাপ হতেও সময় নেয়, কিন্তু আমরা সেটা দেখিনা। ভাল সময়কে উপভোগ করতে করতে যখন খারাপ আসে, তখন যতো

হাহাকার হুহুকার, সময়টাকে একটু ভাল বাসতে পারলে আর তার সাথে বন্ধুত্ব করলে সেও বন্ধুত্ব বজায় রাখবে আমার মনে হয়, তাকে ধরে বেঁধে রাখতে পারলে তো কথাই নেই । কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয় বন্ধু - আজ "বন্ধু দিবস' উপলক্ষে আমাদের সবাই এর এক অচেনা বন্ধুর জন্য রইলো এই কবিতা।

থাকনা আজ আমার সাথে,
কোথায় যাবি এখন?
হোকনা আজ একটু দেরি,
সূর্য ডুববে'খন...

তুইতো সময়...
থাকনা থেমে,
আমার সাথে একটু...

এইত ভাল,
কেউতো নেই...
শান্তি কত বলত ?

থমকে যানা একটুখানি,
তুলি একটা ফটো?
কি আর হবে...। একটু দেরি?
তাড়া তোর যত !!

তুই হ না একটু মানুষ ঘেঁষা,
আয় না হাতের মুঠোয়,
স্কুল এ না হয় তখনই যাব,
যাক না সব চুলোয়...।

তবে কিন্তু একটা বিপদ,
আছে আমি জানি,
তোকে যেদিন আটকাতে পারব...
দেবতার মানহানি...

স্বপ্ন

অভিষেক চক্রবর্তী

আলো আঁধারের লুকোচুরীতে,
কৃত্রিমতার হামাগুড়িতে,
জীবন যখন ক্লান্ত প্রাণ,
স্বপ্ন লোকের মায়া কাঠিজাল,
তখনই হয় বিরাজমান.

শত দুঃখ, হাজার বেদনা,
কত মানুষের কত বাসনা,
চিত্র বিচিত্র গভীর কামনা,
ফুটিয়ে তোলে সব স্বপ্ন চেতনা

বাস্তবতার পৃথিবী পেরিয়ে,
হিংসা লোভের বাঁধ কাটিয়ে,
আলস্যতার জড়তা ঘুচিয়ে,
স্বপ্ন মনকে দেয় জুড়িয়ে

স্বপ্ন মনকে করে সিক্ত,
স্বাদে তা মিষ্ট নয়তো তিক্ত,
স্বপ্ন মনকে দেয় ছন্দ,
দেয় সুখ দেয় আনন্দ

কিন্তু তাতো খানিকক্ষণ,
তারপরই তো এই দুনিয়ায়,
চলে আসে প্রাণ, চঞ্চল মন,
আধুনিকতার চঞ্চলতায়,
কর্মমুখর যানত্রিকতায়,
ভেস্তে যায় স্বপ্নজাল,
চোখের কোণে যায় দেখা ওই -
বেদনা পূর্ণ অশ্রুজল..

সূচীপত্র

অজুহাত

অভিষেক চক্রবর্তী

-তুই এবার যা তো দেখি, অনেক রাত হয়ে গেছে, আমি ঠিক থাকব, দেখনা এখন প্রচুর লোক স্টেশনে থাকবে সারা রাত, এত রাতে অনেকেই বাড়ি ফেরার কিছু পাবেনা, আমি ঠিক মানিয়ে নেব, আর এই চেয়ারটায় বসেই রাত কাটিয়ে দেব , তুই তাড়াতাড়ি বাড়ি যা, নাহলে তোর বাড়ির লোক ও চিন্তা করবে, ট্রেনটা যে এত লেট করবে কে জানত!!!

-হুম ঠিকই বলেছিস, কিন্তু তোকে একা ফেলে যেতে ভয়ও লাগছে...কিন্তু আমাকে তো বাড়ি ফিরতেই হবে, কি যে করি ???

-তোকে তো বললাম, চিন্তা করিস না, আমি ঠিকই থাকব, এত লোক আছে তো, ওই তো ওই কাকু কাকিমার পাশে বশে থাকব, সকাল হলেই তো বাস চালু হয়ে যাবে, তখনি বেরিয়ে যাব, তুই যা

-সিওর?

-ইয়েস !

রাজীব আস্তে আস্তে স্টেশন এর বাইরে মিলিয়ে গেল

রিচা তখনও স্টেশন এর বাইরের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে বসে আছে

দশ মিনিট পর রাজীবকে ভিজে মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এগিয়ে আসতে দেখল রিচা

-কি হল?

-কি করব? বাড়ির লোকই বাড়ি ফিরতে মানা করল আজ রাতে, আমিতো শুধু গুরুজনদের আদেশ পালন করছি....মিচকে হাসি রাজীবের

-সত্যি বল, কি হল? তুই বাড়ি গেলিনা কেন? রিচা অস্থির

- আরে বাড়িতে বললাম, বাইরে রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ, বাস ট্যাক্সি কিচ্ছু পাওয়া যায়না, বৃষ্টিতে সব বন্ধ, এই সময় হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোন গতি নেই, এটা বলতেই বাবা বললো - "তুই বরং স্টেশন এই থেকে যা আজ, ওখানে প্রচুর লোকের মাঝে নিরাপদ থাকবি, কাল সকালে প্রথম বাস ধরে বাড়ি চলে আসিস, রাত বিরেতে আর কলকাতার রাস্তায় তোকে হাঁটতে হবেনা, তাতে বিপদ আরো বেশি" আবার মিচকে হাসি রাজিবের

-এত নাটক করিস কেন? সোজা কথা বলতে কি হয়? আর বাড়ি যখন ফিরবিই না, দশ মিনিট এর জন্য এই নাটকটা কি না করলেই হতনা?আবার তার ওপর বাইরে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতেই বা কে বললো? ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি রিচার

-তুই বুঝবিনা. বৃষ্টিতে না ভিজে বুদ্ধি খুলছিলনা, বাড়িতে কি বলব ভেবে পাচ্ছিলামনা, ফোন বুথটা তো স্টেশনের একটু বাইরে, তাই ভিজে গেলাম, আর ম্যাডাম, এই নাটকটা না করলে আপনার চোখে এই একটা কিছু হারিয়ে গিয়ে আবার ফিরে পাবার আনন্দটা যে দেখতে পেতামনা, যাই হোক, আমার খুব খিদে পেয়েছে, একটু কেক আর কফি আনছি, তারপর সারা রাত ওই কাকু কাকীমার পাশে থাকবি না আমার সাথে গল্প করবি, সেটা ঠিক কর জলদি

কফি কিনতে কিনতে রাজীব রিচার দিকে দুর থেকে দেখছিল, রিচার চোখের কোণে চক চক করছিল কিছু একটা ...দুর থেকে সেটা চিনতে ভুল করেনি রাজীব....ওই আনন্দ অশ্রু রাজীবকে আজ অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে.....

প্রেম

প্রেম কি শুধুই মানবজাতির, জড়বস্তুর নয়?
প্রেম কি শুধুই হৃদয় ভরা, নিবেদন করতে হয়?

প্রেম কি শুধুই দুটি আত্মা, আর তাদের টানাপোড়েন?
নাকি শুধুই কাহিনী সমূহ যেগুলো কবিরা লেখেন?

প্রেম কি সেটা নয়, যেটা আছে সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্রের?
নাকি সেটা নিছকই একটা অধ্যায় পদার্থ বিজ্ঞানের?

প্রেম কি তাহলে নেই বলছ প্রজাপতি আর দোলচাঁপার?
প্রেম কি শুধুই মানবজাতির, বিনুনি আর মাথার?

প্রেম কি তাহলে নেই বলছ নদীর আর সমুদ্রের?
তাহলে তো তাদের মিলন অবৈধ. মোহনা নামটা নিচু জাতের

প্রেম কি তাহলে ঋতু কেন্দ্রিক, বসন্ত তেই আসে?
বর্ষা যে শুধু বন্যা আনে, গ্রীষ্মকে কে ভালবাসে?

প্রেম তাহলে নেই বলছ, ভালুক আর মৌচাকের?
জঙ্গল কি শুধুই হিংস্রতা, সম্পর্ক খাদ্য খাদকের?

এই যে শুধু ঘুরেই চলেছে,
ইলেকট্রন আর প্রোটন,
প্রেম না বলে কি যে বলি?
তাদের মাঝের আকর্ষণ বিকর্ষণ?

ভোরের সূর্য ওঠেই হয়তো,
নোনা জলে স্নান করতে,
সমুদ্রের সাথে প্রেমের টানেই,
হয়তো বাধ্য হয় ফিরে আসতে

অদ্ভূত ভাবে সব পাখি গুলো আসে,
উড়ে উড়ে সাইবেরিয়া থেকে,
প্রেমের টান কি নয় সেটা?
শুধুই কি পেটের ডাকে?
প্রেম কি তাহলে নেই বলছ?
প্রকৃতি আর পাখির মধ্যে?
প্রেম কি শুধুই পায়রা বোঝে?
চিঠি বহনের মাঝে?

প্রেমটা বোধ হয় সমস্ত কিছু,
গাছ পাতা সালকসংশ্লেষ
প্রেমটা বোধ হয় হিমালয়,
আর মরুভূমির দস্তাবেজ
প্রেমটা বোধ হয় আকাশ ছোঁয়া,
রামধনু আঁকা অর্ধেক শূন্য,
মাঝে মাঝে ভীষণ রাগী,
বজ্র বিদ্যুৎ পূর্ণ

আমার কাছে প্রেমের গল্প,
শুধুই মানুষ নয়
প্রেমটা হল সমস্ত কিছু,
উপলব্ধি করতে হয়

প্রেম কি শুধুই মানবজাতির, মহাবিশ্বের নয়?

প্রেম কি শুধুই হৃদয় ভরা, নিবেদন করতে হয়?

পাহাড়ে যখন সন্ধ্যা নামে,
বিশালতা যায় ঢেকে
তখন তার শব্দ শুনো,
তার নীরবতাই প্রেম হাঁকে
আমরা দেখি, বর্ষা এলে বৃষ্টি নামে,
ময়ুর নাচে, পেখম তুলে...
হয়তো বৃষ্টি, হয়তো বর্ষা,
আসেই তারা, পেখম মেলার প্রেমে

সূচীপত্র

অংশুমান নন্দী

লচা

লচা, ঠিক শুনেছেন পচা নয়, লচা। ছোটবেলা এ বাপ্ মা নাম দিয়েছিলো পদ্মলোচন। আজ গ্রামের লোক তার অপভ্রংশকে আপন করে নিয়েছে। কিন্তু লচাকে কেউ আপন করেনি। ছোটবেলা থেকে ছুটে চলেছে, শুরু নেই শেষ নেই। নুন আন্তে পান্তা ফুরোয় যে ঘরে, ভাঙ্গা টালির চাল থেকে স্বপ্ন নেমে আসে যেখানে - সেখানে আবার শরৎ আর দুর্গাপুজো। তাও লচা চেয়ে থাকে পুজোর কটা দিনের জন্য। নতুন জামা না হোক পেট ভরা ভাততো আসে। গ্রামে নয় নয় করে এক কুড়িটা পুকুর। আর হয় পুকুর ভর্তি পদ্ম। মহাজনের ঘরে যারা কাজ করে আর বাবুর জন্য যারা পতাকা নিয়ে লড়াই করে, তারা তো নামবে না পদ্ম তুলতে। সাপের ভয়ে কোনো ভদ্র ঘরের ছেলে ধারে কাছে আসে না।আর পুজোর সময়ে তো আলাদা ব্যাপার।

লচা নামে।

মা প্রতিবছর এসে লচাকে স্বার্থকনামা করে যে।
সে এক অদ্ভুত লুকোচুরি - লচা, মা দুগ্গা, আর মা মনসা।
প্রতিবার মা দুগ্গা লচাকে গোল্ড মেডেল দিয়ে যায় আর ....
যাবার আগে বলে যায় - আসছে বছর আবার হবে।

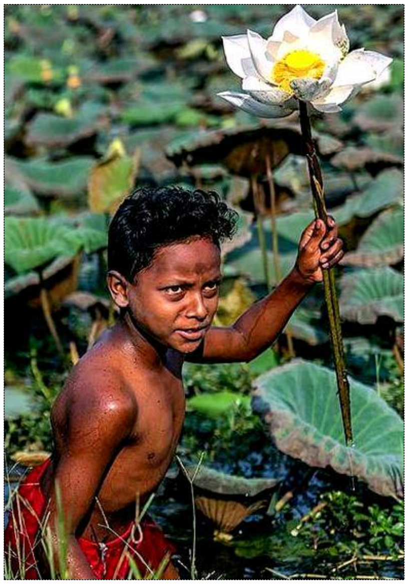

সংকীর্ণতার মলাট

লে লিজিয়ে সাব, পাক্কা কিতাব হ্যায়.. বাস কভার থোড়া গন্ধা হ্যায়, সুবহাসে কুছ নাহি বিকা
চোখে রে-ব্যানের পোলারয়েডের মধ্যে দিয়ে বইটা দেখছি -
ইকোনমিক্স নিয়ে একখানা পরিপক্ক বিশ্লেষণ, খাঁটি ঘানির, একেবারে ষোলোআনা -
তবে হলাম গিয়ে কি না উচ্চচরিত্রের মধ্যবিত্ত, নোংরা যে ঘাঁটিনা
অরিজিনাল পাঁচশো রুপায়া সে ডুপ্লিকেট প্রিন্ট দোশো .. অর ইয়ে নব্বই পে...
বাস রাস্তে সে লে লিজিয়ে স্যার...আপতো ইতনা নলেজেবল হো...
জিস সেব হাম খাতে হ্যায় আপ উও লেকে চলতে হো
(আপেল ম্যাকবুকের এর লোগোটা চমকাচ্ছে তাহলে)
নিতে পারিনি সেদিন
যতই হোক, ঘরে তো তোলা যায়না, হাজার হলেও রাস্তার মাল
মনের সংকীর্ণতা -
মলাটেই আটকে থেকে গেছিল.. নোংরা হয়ে

বন্ধুত্ব

বেশ...যদি নাই করি, কিসের বন্ধু তবে?
রেশ টানি, চয়ন করি, পরানজোড়ে চরণ ধরি
গাঁট্টা মেরে ঠাট্টা করি
তবেই তো শোধ হবে।
বন্ধু ভুল বুঝোনা,
নিজের করে নিজের কাছে নিজেরমতো টেনে নিও
আর'তো ক'টা বছর
সমান নয় পাঁচটা আঙ্গুল, দাগগুলোতো এক
ইকিরমিকির না খেললে, কিসের বন্ধু তবে ?

সূচীপত্র

শনৈ: শনৈ:

মাধুরী সিনহা

ছোট্ট মফস্সল শহরের এক নিতান্ত সাধারণ মেয়ে। গাছ যেমন প্রকৃতির নিয়মে তার স্বাভাবিক গুনগত মান বজায় রেখে বড় হয়ে ওঠে, তেমনই বেড়ে ওঠা। বাড়িতে শক্তিপূজার বার্ষিক আরাধনা, কিন্তু নিত্যপূজা কেষ্টরায়ের। সুতরাং ভগবানে বিশ্বাস ছিলোই। বছরকার বাড়ির পুজোয় খুব আত্মিকভাবে বাবা-মা-দাদাদের অংশ নিতে দেখেছি। বাবা-মা ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু গিভ-এন্ড-টেক পলিসির উপর নয়। কুসংস্কার প্রায় ছিলই না; ছোঁয়াছুয়ি, সকরি-বিচার - মানতেন না, যা সমসাময়িক সবার থেকে আমাদের মনকে অনেকটাই উঁচুতে তুলে দিয়েছিল। এখন তা খুব ভাল বুঝতে পারি।

পড়াশোনা শেষ হয়ে বিবাহ। এখানেই আমার জন্যে অনেক চমক ছিল। বিয়ে হয়ে এসে দেখি, আজ অব্দি যে সকল ঠাকুরের পূজা হতে দেখেছি - অর্থাত কালী, দূর্গা, কৃষ্ণ ইত্যাদি - যাঁরা প্রায় সব সাধারণ পরিবারের ঠাকুর ঘরেই নিত্যসেবা পান - তাঁদের কারুর ফটো এবাড়ির ঠাকুর ঘরে নেই।

প্রধান যাঁর ফটো দেখলাম তা যে আমি চিনিনা তা নয় - শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের। কিন্তু ভারী অবাক হয়েছিলাম যে - এঁরা তো মানুষ ছিলেন, ঠাকুর তো নন। তবে অন্য ঠাকুরের ফটো নেই কেন ?

বলতে সংকোচ নেই বহুদিন অব্দি সেভাবে বিশ্বাসও করিনি। এই রামকৃষ্ণ ঠাকুরের নাম শোনার সৌভাগ্য হয় ছোটদাদার মাধ্যমে। কলকাতায় থাকার কারণে পুরানো জামাকাপড় সে নিজ প্রবৃত্তির টানে রামকৃষ্ণ মিশনে দান করে আসত। মা মাঝে মাঝে বারণ করতেন ঘন ঘন যেতে। ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। সুতরাং সেই ঠাকুরের ছবি দেখে প্রথমে মোটেই আমারও ভক্তি জাগেনি।

কিন্তু কি এক অমোঘ আকর্ষণ। নিজের অজান্তেই আজ - ঠাকুর, মা, স্বামীজির - এঁদের নিয়েই সারাদিন কাটে। বাড়ির সবাই আলোচনাও করে। অদ্ভুত এক ভালো লাগার অনুভূতি - যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শুধু বোঝা যায় তিনি আছেন তা চরম সত্য, যার সাহসেই মনে এক অদ্ভুত শান্তি।

আজ যখন ঠাকুরের বাণী শুনি, সারদামায়ের কথা শুনি - মনে পড়ে আমাদের জীবনে কিছু

ঘটনা কি অদ্ভুত ভাবে ঘটে গেছে।

সরস্বতী পুজোর দিন। সকাল থেকে উপোষ করে আছি, এক আত্মীয়ের বাড়িতে অঞ্জলি দিতে যাবো। সালটা ২০০৬। বাড়িতে ফোনে বারবার ডাক। তাড়াতাড়ি করতে হবে, পুরুত চলে যাচ্ছে। তার যে সময় নেই - অন্য পুজো করতে হবে। আত্মীয়ের বকাবকি, রাগারাগি শুনে ছোড়দা হঠাত বললো - "যাবো না অঞ্জলি দিতে! আজ আমরা বাড়িতে মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করবো!" পরের বছরও একই ভাবে গর্ভধারিনী মায়ের পায়ে ফুল দিয়েছিলাম। সরস্বতী পুজো এলেই আজও একথাই মনে পড়ে।

বাবা ছিলেন সৎ, রাশভারী এক মানুষ। আমরা খুব ভয় পেতাম। বিয়ের পর বাবার সাথে একা দেখা করতে গেছি, তাড়াতাড়ি ফিরবো। ফেরার সময় বাবা বললেন "আর তো তোমাকে আটকাতে পারি না"। জীবনে সেই প্রথম, বাবার মুখে "তুমি" ডাক শুনলাম, আর বাবার চোখে প্রথম জল দেখলাম। যা আজও চলার পাথেয়। সারাজীবন সঙ্গে থেকেও আমরা বোধহয় মানুষকে বুঝে উঠতে পারি না। খুব স্পষ্টভাবে বাবা আমার স্থান বুঝিয়ে দিয়েছিলেন- যা পিতার ধর্ম।

সংস্কৃত মাস্টারমশাই। বাড়ি এসে পড়াতেন। অত্যন্ত স্নেহ করতেন।সংস্কৃত পাঠের সাথে সাথে আমাকে মানুষ হিসেবে গড়তেন। শেখাতেন, যে সংস্কৃত পড়বে "সে বিনয়ী হবে, ফলভরা গাছের মত", "মানুষকে ক্ষমা করবে"।"নিজের স্বামী কিছু দান করলে তাকে আটকাবে না"। "সকলকে মানুষের মতো দেখবে"। এমনকি বাড়ির কাজের লোককেও। মনের সংকীর্ণ ভাব দূর করবে - সব সময়ে নিজেকে বিচার করতে থাকবে।

এর অনেক দিন পরে। দিল্লীতে আছি। ছেলে ছোট, স্বামীর অফিসের চাপ, নতুন সংসার - সব মিলিয়ে নিজেই আর চাপ নিতে পারছিলাম না। একটি রান্নার লোক তখন খুবই লাগবে - যে একটু সাহায্য করে দেবে। অনেক খোঁজার পরে এক মুসলিম মহিলা ঠিক হলো। মনের চরমতম কোণের এক সংকীর্ণতা দূর হলো। সেই মহিলা রান্না না করে দিলে আমাদেরও খাওয়া হতো না। সে দিনের সেই ঘটনা আজও মনকে নাড়া দেয়।

একথা বলব না যে আমি এসব শুনে একদিনেই পাল্টে গেছি। তবু বলব আজ নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে শনৈ: শনৈ: ঠাকুর যেন এই কথাগুলিই অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। টেনে নিয়েছেন আরো কাছে।

সূচীপত্র

দুই পাখি

অন্তরা মিত্র

সৃতিক বেরিয়েছে অফিস। সকাল থেকে আজ আকাশটা মেঘলা করে আছে, চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে স্নেহা তার প্রিয় বারান্দাটায় এসে বসে। সকালের দৌড়ঝাঁপের পরে খোলা হাওয়ায় একটু অবসর সময় কাটাতে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে তার প্রিয় মাধবীলতার গন্ধভরা বাতাসে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেয় স্নেহা। একটু পরে লক্ষ্য করে তার কিট্টু পিকুর ঝগড়া। খুনসুটির শেষ নেই দুটোর। কখনও একটা জিনিস নিয়ে টানাটানি, কখনও একে অপরকে ঠোকরাচ্ছে। খুব হাসি পায় স্নেহার। হ্যাঁ, কিট্টু পিকু স্নেহার দুই টিয়া পাখি, খুব আদরের। ওদের যত ঝগড়া, তত ভাব। স্নেহারও মনে হলো ওদের সাথে খুনসুটি করে। দুটিতে খুব ঝগড়া করছে, একে অপরকে ঠোকরাচ্ছে, মারামারি করছে। স্নেহাও যোগ দেবে বলে উঠে গিয়ে কিট্টুকে বের করে নেয় খাঁচা থেকে - " যা, কর এবার কত ঝগড়া করবি"। কিট্টুকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলো স্নেহ। কিন্তু পরক্ষণেই পিকুর আর্তনাদ কানে বেজে ওঠে তার। কেমন যেন স্পষ্ট স্বজন হারানোর ব্যথা ভরা সুরে ডাকতে লাগলো পিকু। কিট্টুকে ফিরে পাওয়ার করুণ অনুরোধ যেন।

পাখিটাকে নিয়ে চেয়ারে বসে থাকা স্নেহার নজরে এলো সামনে টি-টেবিলে রাখা নিউজপেপারটা। প্রথম পাতার প্রথম সারির খবরে রয়েছে - *মেয়ের সিঁথির সিন্দুর মুছলো বাবা, ভিন জাতের ছেলেকে বিয়ে করার অপরাধে।*

বুকের ভেতরটা কেমন মোচর দিয়ে উঠলো স্নেহার। সব ভেদাভেদ মুছিয়ে সকলকে এক করতে পারা ভালোবাসার ভাষাকে এই অবোধ জীব বুঝতে পারে অথচ মানুষ হয়ে আমরা পারি না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবের এই অসহায়তায়, এই অক্ষমতায় যেন এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো স্নেহার...

হঠাৎ দেখা

বৃষ্টি ভেজা দুপুর, চারদিকটা ফাঁকা,
চৌরাস্তার মোড়ে সেদিন হঠাৎ দেখা,
"ওরে অনির্বাণ না, কি কেমন আছো?
সেই কলেজ ছাড়ার পর একেবারে
- ভুলেই গেছো"
"সেদিন তোমায় ভুলে যাবো, জীবনটা কি
- থাকবে আর,
তোমার মতন এমন মানুষ আসে জীবনে
- একটিবার,"
"তোমায় দেখে পড়ছে মনে, প্রথম কলেজের
- দিনটি,
সেদিন আমাদের প্রথম আলাপ, সেদিন সেকি
- খুশি,
সেই লেট করে ক্লাসে ঢোকা,

তার উপরে স্যারের বকা,
সেদিন প্রথম পাশে বসা, সেই তো প্রথম
কাছে আসা
একটুও পাল্টাওনি, আজ যেন সেই কলেজের
- প্রথমদিনে ফিরে পৌঁছে আসি,
আমার কাছে যেন চিরনতুনই থাকবে তুমি,"
"ও সেই তুমি রমা, তুমিও তো পাল্টাওনি,
সেই তাঁতের শাড়ীর লুটিয়ে পড়া আঁচল,

- সেই লম্বা চুলের বেনী,
সেই টানা চোখের কাজল, সেই
মিষ্টি মুখ খানি,
যেন সদ্য ফোটা গোলাপ,
যেন পূর্ণ চাঁদের চাঁদনী,

02 Monday
092-273 • Week 14

জীবন রয়ে গেছে একই রকম,
সেই শুরু প্রথম কলেজের দিনগুলোর,
যখন এ মন ছিল শুধু বাউল,
যখন ছিল না তায় চলাবুলো।"
" পড়ছে মনে কলেজ কোণে একসাথে -
- ফুচকা খাওয়া,
একাডেমির কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে বসে,
একসাথে চা খাওয়া,
কাগজের জলে তেল মিশিয়ে,
হাতে হাত রেখে হেঁটে যাওয়া,
সঙ্গী থাকত সুখ দুঃখ, সঙ্গী থাকত
ক্ষুব্ধ হওয়া।"
" সবই আজ বন্দি হয়েছে স্মৃতির খাতায়,

03 Tuesday
093-272 • Week 14

সেখানে তোমার নাম প্রত্যেক
- পাতায়,
যে নামের সাথে ভালবাসা আমার
- জড়িয়ে আছে,
যা পারিনি বলতে কোনোদিন তোমার
- কাছে।
ভয় পেয়েছিলাম, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের
কথা ভেবে,
আর তোমায় হারিয়ে ফেলি পাছে।
আজ এই দিনটাও একটা নতুন পাতা
জুড়ে দেবে আমার স্মৃতির খাতায়,
কিংবা রয়ে যাবে এক বিশেষ দিন হয়ে
আমার মনের লুকোচুরি খেলায়।

যাই হোক, থাক আজ সে সব কথা,
পুরোনো কথা শুধু বাড়াবে মনের ব্যথা
থাক না সেসব স্মৃতির খাতায় তোলা,"
"হুম, এখনতো শুধু নতুন কথা বলা,
অনির্বাণ, তবু একটা কথা বলি তোমায় আজ,
এই পৃথিবীতে একা বেঁচে থাকা বড়-
-কঠিন কাজ,
সেই পুরোনো কলেজের দিনগুলো ছিল
-অনেক ভালো,
তুমি হয়তো মনের খাতায় দাওনি পড়তে
- আলো,
তবু বলি, সেদিন কিন্তু আমিও তোমায়
বেসেছিলাম ভালো।।"

দৃষ্টি

সৌমিক পাইন

কিছু ঘটনা জীবনে এমন রেখাপাত করে যায় যে যেটা বাধ্য করে ভাবতে যে, সম্পর্কের এমন কিছু অনুভুতি আছে,যাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়, বুদ্ধি বিচারের তা বাইরে। আজও চোখে ভাসে সেই না ভুলতে পারা মুহূর্তগুলো, আমি তখন কর্মসূত্রে এক শহরে স্থানান্তরিত, একটা ছোট ঘর ভাড়া করে আছি, বাড়ি থেকে দূরে থাকার জন্যে মনটাও খারাপ। কিন্তু কি করে একদিন অর্পণের সাথে আলাপ হল, আমার সহকর্মী ছিল, তার সাথে আড্ডা মেরে সময়টা বেশ সহনীয় হয়ে উঠতো।

মাঝে মাঝে আমরা বেরিয়ে পড়তাম অফিস ছুটির পর,আবার কখনো ছুটির দিনে একসাথে কোথাও হারিয়ে যেতাম প্রকৃতির কোলে ,বেশ ভালই কাটছিল দিনগুলো। দুয়েক বার আমি অর্পণের বাড়ি গেছিলাম,ওর বাবা-মা অনেক দিন আগেই গত,একজন বয়স্ক কাকা থাকতেন বাড়িতে।

একদিন আমরা ঘুরতে গেছি বিকেল বেলায়,সূর্য অস্ত যাচ্ছে ,দেখি অর্পণ চুপ করে দেখছে ডুবন্ত সূর্যকে।

- "কি হল রে? একপানে সূর্য দেখছিস যে বড়ো।"

অর্পণ বলে উঠল - "ডুবন্ত সূর্যকে দেখেছিস ভাল করে কখনো? ডুবন্ত সূর্য অনেক কিছু শিখিয়ে যায় কিন্তু। সকালের সূর্য সঙ্গে নিয়ে আসে নতুন আশা, বেঁচে থাকার প্রেরণা,জীবন যুদ্ধের নতুন অঙ্গীকার। আর বিকেলের পড়ন্ত সূর্য সঙ্গে নিয়ে যায় সেই দিনের সব কাহিনী, কত জিতে যাওয়ার আনন্দ আর কত হেরে যাওয়া,পরাজিত হবার ঘটনার দুঃখ,তাই দেখছিলাম - আজকের ডুবন্ত সূর্যের দিকে চেয়ে একটু, তার মনের না বলতে চাওয়া ঘটনাগুলোকে অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম।"

আমার বেশ ভালো লাগলো - "তুই তো পুরো দার্শনিক হয়ে গেছিস"!

অর্পণ হেসে বলল - "ধুর, ছাড় ! চল যাই আজকে তুই আর আমি ডিনার করব আমার বাড়িতে,আজ আমার জন্মদিন।"

আমি ওকে শুভেচ্ছা জানালাম,একটু রাগও করলাম আগে না জানানোর জন্যে।

অর্পণ বলল "ওকে গুরু, এবার রাতে জলদি চলে আয়। গল্প করব,তখন যত খুশি গালমন্দ

করিস। আসলে আমি একটা কাজে আমার পুরানো বাড়িতে যাচ্ছি কাল, চার-পাঁচ দিন পরে ফিরব”।

চার-পাঁচ নয়, প্রায় দিন দশেক পর অর্পণ ফিরল, বিধ্বস্ত, যেন কোন ঝড় বয়ে গেছে ওর উপর দিয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম “কি হয়েছে?” বললো - “তোকে সব বলব ভাই, অনেক না বলা কথা জমে আছে”।

- "কি ব্যাপার? এক্ষুনি বল"

অর্পণ বলল “না, আজকেই নয়, কিছুদিন পর” ।অর্পণের এই শেষ কথাটার মধ্যে যেন এক অন্য অনুভুতি ছিল, কিরকম যেন একটা - খুব যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জয়ের আনন্দ।

এরপর আমি হঠাত অফিসের কাজে বাইরে গেছি পরের দিন, টেনে দিল প্রায় মাস খানেক, ফোন করতাম অর্পণকে কিন্তু ফোন তুলতো না।

ফিরেই, আগে রেখে দৌড়ালাম অর্পণের বাড়িতে।

অর্পণের বাড়ির সামনে যেতেই একটা হাল্কা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল আমার উপর দিয়ে। মনে হল কেউ আমাকে জড়িয়ে ধরল,আমি এগোলাম, কলিং বেল বাজালাম, অনেকক্ষণ পর ওর কাকা এসে দরজা খুললেন, - "কাকু, অর্পণ কোথায়?"

"ভেতরে এস বাবা" - ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম তাতে আমার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। আমার সামনের দেওয়ালে অর্পণের মালা দেওয়া ছবি টাঙ্গান।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সোফাতে বসে পড়লাম,মাথার মধ্যে কিছু ঢুকছিল না।

- ”কি হয়েছিল যে অর্পণকে চিরকালের জন্যে আমাদের থেকে এত দূরে চলে যেতে হল?”

কাকা কাঁদতে কাঁদতে বললেন ”আমিও কিছু বুঝতে পারছিলাম না, বাবু কেমন চুপচাপ হয়ে গেছিলো, কোন কথা বলতো না,খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর একদিন হার্ট অ্যাটাক। তোমার জন্যে বাবু এটা রেখে গেছে।"

কাকা একটা বড় প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে।

ঘরে ফিরলাম একরাশ বেদনা, দলা পাকানো একটা কান্না সঙ্গে নিয়ে।

রাতে ঘুম আসছিল না, অর্পণের দেওয়া প্যাকেটটা খুলে দেখা যাক। মাত্র একটা ডায়েরী, আর একখানা দলিল।

দলিলটা - অর্পণ ওর বাড়ির অংশটা আমার নামে করে দিয়েছে। এ আবার কি কান্ড ? কারণ খুঁজতে অর্পণের ডায়েরি খুললাম। জানতে পারলাম অর্পণের ব্যাপারে অজানা অনেক কিছু,যতই পড়ছি এক এক বিস্ময়।

এত গভীর অনুভুতি বোধ ছিল ছেলেটার !

এইবার আমি সেই জায়গাতে এসে পৌঁছালাম,যেখান থেকে অর্পণের জীবনের মোড় ঘুরতে শুরু করে। কলেজে পড়ার সময় স্বাতীলেখা বলে একটি মেয়েকে ভালবাসত, একসাথে পুরো জীবন কাটানোর প্রতিশ্রুতি, পরে কিছু ছোট ছোট কারণে ভুল বোঝাবুঝি, যখন তারা ভুল বুঝতে পারে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়ে যায় আর অর্পণ তখন চাকরিও পায়নি,তাই শেষ অব্দি দুজন আলাদা হয়ে যায়।

এই বিচ্ছেদ অর্পণকে খুব ভেতর থেকে ভেঙ্গে দিয়েছিল, চুপ করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু জীবনের খেলা বোধহয় অত সোজা নয়।

মাসখানেক আগে হসপিটালে গিয়ে ... অর্পণের হার্টে ছোটবেলা থেকেই একটা ফুটো ছিল, হাসপাতাল ওকে মাঝে মাঝেই যেতে হতো, হঠাত দেখা স্বাতীলেখার সঙ্গে। সেদিনই ছিল ওর জন্মদিনও, যে বিকেলে বসে ও ডুবন্ত সূর্য দেখেছিল। স্বাতীলেখার পাঁচ বছরের ছেলের দুরারোগ্য চোখের অসুখ, একমাত্র উপায় কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন, অর্পণ কথা দিয়েছিল যে সে কিছু ব্যবস্থা করবেই....

ডায়রি পড়তে পড়তে রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই, ভোরে ঘুম ভাঙল কলিং বেলের আওয়াজে। এক অচেনা ভদ্রমহিলা, নমস্কার করে বললেন “আমি স্বাতীলেখা”। ভেতরে আসতে বললাম - "বলুন"।

- “একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছিলাম,কাল আমার ছেলের চোখ খুলবে অপারেশান হওয়ার পর, আসলে অর্পণের ইচ্ছে ছিল যাতে আপনি এই সময়টাতে ওখানে থাকেন”।

- “ঠিক আছে আমি যাব।”

পরের দিন বিকেল চারটে, হসপিটালের কেবিনে আমার সামনে একটা বাচ্চা, তার সামনে স্বাতীলেখা, ছেলেটার চোখের বাঁধন খোলা হচ্ছে, আস্তে আস্তে ছেলেটির চোখ খুললো, তার চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম, অবিকল অর্পণের চোখ, বাচ্চাটি তার মা কে জড়িয়ে ধরল, দুজনের চোখেই জল, আমার চোখের কোণাও ভিজে এল।

- "এটা অর্পণেরই চোখ,ও মৃত্যুর আগে দান করে দিয়ে গেছিলো,আজ ওর জন্যেই আমার ছেলে আবার দৃষ্টি খুঁজে পেয়েছে। আপনার কথা অর্পণ আমাকে বলে গিয়েছিল,আমাকে এও বলেছিল আপনি ওকে খুব ভালবাসেন, খুব কাছের ভাবেন, অর্পণ আর নেই কিন্তু ওর দৃষ্টিটা রয়ে গেল।"

- "আপনি জানতেন যে অর্পণ কিভাবে মারা গেছে?

- "জানতাম,হার্টে একটা ছোট্ট ফুটো ছিল, চিকিৎসা করালে হয়তো...কিন্তু করায়নি।"

এবার বাচ্চাটির কাছে গেলাম, একটা চকোলেটের বাক্স দিয়ে বললাম - ভাল থেকো কাকু। ছেলেটি আমার দিকে চেয়ে বলল "আঙ্কল তুমি কোথায় থাকো?"

আমি বললাম "তোমার হৃদয়ে"।

বাচ্চাটি হাসল বলল "কাকু তুমি খুব ভাল,আমাদের বাড়ি আসবে কিন্তু..."

- যাব,আমাকে যেতেই হবে।

ভালবাসা সব করিয়ে দেয়, সহ্য করতেও শিখিয়ে দেয়। আমি যখন নেমে আসছি তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে,আমি তাকিয়ে বললাম - সত্যই তুমি অনেক মহান, যেমন তুমি আসার সময় নতুন বার্তা নিয়ে আস, তেমনি যখন যাও , অনেক যন্ত্রণার সাক্ষী হয়ে যাও,হয়ত কত পাওয়া, কত হারানোর যন্ত্রণা তোমার অন্তরে লুকিয়ে থাকে।

র্পণরা কখনও মরে না ,তারা বেঁচে থাকে মানুষের মধ্যে এক নতুন আশার আলো জাগিয়ে, নিজেদের হৃদয়ের পরশ দিয়ে। এরই নাম প্রেম।

আমি ওখানে আর বেশিদিন থাকিনি,অর্পণের কথা খুব মনে পড়ত,অর্পণের বাড়ীটা আমি দৃষ্টিহীনদের লেখাপড়ার জন্যে একটা সংস্থাকে দিয়ে এসেছিলাম, এখন তার অর্পণ দৃষ্টি বিদ্যালয়। আমি যাই মাঝে মাঝে ওখানে, গেলেই সেই একটা হাল্কা ঠাণ্ডা হাওয়া আমাকে সবসময় জড়িয়ে ধরে আর হেসে বলে - "কি গুরু কেমন আছ?"

সূচীপত্র

মৃত্যু ও মায়া

কৌস্তভ চৌধুরী

মৃত্যু - এক চরমতম বাস্তব। কিন্তু তাও আমরা কোনো মানুষই সেই মৃত্যুকে মেনে নিতে পারিনা। আসলে আমরা মৃত্যুকে মেনে নিতে পারিনা একটাই কারণে, সেইটা হলো "মায়া"। ভগবানের তৈরি এই মানব দেহে রয়েছে এক অমূল্য সম্পদ। তার নাম হৃদয়। যার মধ্যে বাস করছে মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা, ক্রোধ, হিংসে, লোভ নামক কিছু উৎসেচক। যার মধ্যে মায়ার মায়া কাটানো বড়ই কঠিন কর্ম।

কৈশোরে একটা গল্প পড়েছিলাম --
একদিন দেবর্ষি নারদ ভগবান শ্রী বিষ্ণুকে প্রশ্ন করেন "প্রভু মায়া কি জিনিস?"
উত্তরে ভগবান বলেন "দেবর্ষি এত অল্প কথায় আমি তোমাকে মায়ার ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। সঠিক সময় আসলে তুমি নিজেই এর উত্তর পাবে।"
এরপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়। নারদ তার প্রশ্নের কথা নিজেই ভুলে যায়। বহু দিন পর একদিন ভগবান বিষ্ণু এবং নারদ মর্ত্যে ভ্রমণে আসেন, পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে ভগবান নারদকে বলেন "নারদ আমি ভীষণ পিপাসার্ত, আমাকে একটু জল পান করাতে পারো?" নারদ বলেন "প্রভু আপনি এই বটবৃক্ষের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করুন আমি এক্ষুনি আপনার জন্য জল নিয়ে আসছি।" এই বলে নারদ জলের খোঁজে বেড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু বহু দূর অগ্রসর হয়েও কোথাও একফোঁটাও জলের খোঁজ পাওয়া গেলোনা। এইদিকে সন্ধে নেমে আসছে আর আকাশের অবস্থাও ভালো নয়, যে কোনো সময় ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। জলের সন্ধানে ব্যর্থ নারদ অবসন্ন মনে যখন একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাবছেন যে কি ভাবে তিনি তার প্রভুর তৃষ্ণা মেটাবেন ঠিক সেই সময় দূরে তিনি একটি প্রদীপের আলো দেখতে পেলেন। তাঁর মনে ঈষত আশার সঞ্চার হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই আলোকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলতে লাগলেন। এইদিকে ভয়ঙ্কর ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হলো। সেই বৃষ্টিতে পুরো সিক্ত হয়ে নারদ একটি কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। কুটিরের দরজার কড়া নাড়ালেন তিনি। কুটিরের দরজা খুলে গেলো। এক অপরূপ সুন্দরী রমণী দরজা খুলে দেবর্ষির সম্মুখে দাঁড়িয়ে। নারদ সেই রমণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে চিত্ত হারালেন। তিনি ভুলে গেলেন কি উদ্দেশ্যে

এই ঝড়জলের রাতে তিনি এই কুটিরে এসেছেন। কুটিরের অন্দর থেকে এক পুরুষ কন্ঠ ভেসে এলো - "মা !! কে এসেছেন?" উত্তরে সেই অপরূপা রমণী তার পিতার উদ্দেশ্যে জানালেন "একজন অপরিচিত পথিক এই ঝড়জলের মধ্যে সিক্ত অবস্থায় আমাদের কুটিরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে।" তৎক্ষণাৎ তার পিতা তাঁর কন্যাকে আদেশ দিলেন যে এক্ষুনি সেই পথিককে ভেতরে নিয়ে এসো। অতিথি দেবতার সমান, তাই তার যথা সম্ভব সেবা যত্ন করো।

দেবর্ষি নারদ সেই ব্রাহ্মণের আতিথেয়তায় আপ্লুত হলেন। এবং সেই ব্রাহ্মণের অনুরোধে ওইখানেই দিন কয়েক থাকতে সম্মত হলেন।

এইদিকে সেই ব্রাহ্মণ নারদের মত একজন বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানী সুপুরুষ পেয়ে তার কন্যার বিবাহ নারদের সাথে দেওয়ার জন্য উৎসুক হলেন। নারদের কাছে এই প্রস্তাব রাখা মাত্র নারদও সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এরপর একটি শুভদিনে সেই ব্রাহ্মণ কন্যা এবং দেবর্ষি নারদ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

বছর কাটতে না কাটতেই সেই ব্রাহ্মণ অসুস্থতার কারণে পরলোক গমন করলেন। নারদ তার স্ত্রীকে নিয়ে ব্রাহ্মণের কুটিরেই থেকে গেলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই দেবর্ষির স্ত্রী দুই পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। গ্রামেই শাস্ত্র পাঠ ও পূজার্চনা করে দিব্যি সুখে সংসার ধর্ম চালাচ্ছিলেন নারদ। দেখতে দেখতে বারো বছর অতিক্রান্ত হলো।

পাশের গ্রামে বৈশাখী মেলায় স্ত্রী ও পুত্রদের নিয়ে নারদ একদিন ভ্রমণে গেলেন। ফেরার পথে নৌকো করে নদী পারাপার করার সময় ঝড়ে নারদদের নৌকাডুবি হলো। নারদের স্ত্রী ও দুই পুত্র সন্তান জলে তলিয়ে গেলো। বহু কষ্টে সাঁতার কেটে নারদ নদীর তটে বসে বিলাপ করতে লাগলেন। নদীর পাড়েই মলিন পোশাক পরিহিত এক বৃদ্ধ নারদের এই বিলাপ দেখে হাসতে লাগলেন। সেই বৃদ্ধের হাসি দেখে নারদ ক্ষিপ্ত হয়ে তেড়ে গেলেন সেই বৃদ্ধের দিকে। তাকে চিৎকার করে বলে উঠলেন "তুমিকি উন্মাদ? নাকি তামাশা দেখছো? আমি আমার সর্বস্ব হারিয়ে আজ এই নদীর তীরে বসে বিলাপ করছি। আর তুমি ক্রমাগত হেসে চলেছো!!!" উত্তরে সেই বৃদ্ধ বলে উঠলেন "নারদ, আমি উন্মাদও নই , আবার তামাশাও দেখছিনা।" এই বলে সেই বৃদ্ধ

পুনরায় নারদকে বললেন "নারদ আমি খুব তৃষ্ণার্ত, তুমি একটু আগে জল আনতে গিয়েছিলে, এনেছো? আমার জন্য জল এনেছো?"

সম্বিৎ ফিরে পেলেন দেবর্ষি নারদ। তিনি তার অশ্রু ভেজা চোখে সেই বৃদ্ধের মধ্যে দেখতে পেলেন তার প্রভু তথা জগতের ত্রাতা ভগবান নারায়ণকে।

নারদ শ্রী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে বললেন "প্রভু এক যুগ কেটে গেলো আর আপনি বলছেন একটু আগে!! প্রভু কিন্তু এ কি বিপর্যয় ঘটে গেলো?? আমি যে সর্বস্ব হারালাম। আমার স্ত্রী, সন্তান সবাই যে ঐ নদীর জলে তলিয়ে গেলো। আমি আর বেঁচে থেকে কি করবো প্রভু?" নারদের কথা শুনে ভগবান বিষ্ণু ঈষদ মুচকি হাসলেন। তিনি নারদকে বললেন "নারদ, তুমি আমাকে একবার একটা প্রশ্ন করেছিলে যে মায়া কি জিনিস? মনে পড়ছে নারদ?" "হ্যাঁ প্রভু মনে পড়েছে। আপনি বলেছিলেন যে সময় হলে আমি নিজেই তার উত্তর খুঁজে পাবো।" ভগবান বিষ্ণু দেবর্ষিকে বললেন "নারদ তুমি যে অনবরত কেঁদে চলেছো। তোমার স্ত্রী ও সন্তানের বিয়োগে তুমি দিশেহারা হয়ে গেছো। কিন্তু নারদ এটাইতো বিধির বিধান, এটাইতো নিয়ম জন্মালে একদিন মৃত্যুও আসবে।" "কিন্তু প্রভু ওদের কি এইটা মৃত্যুর বয়স? নিষ্পাপ শিশু ওরা, আমার স্ত্রীর বয়সও অনেক কম। তাহলে এতো কম বয়সে ওরা চলে গেলো?" "মৃত্যুর কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই নারদ। এই জগৎ সংসারের সৃষ্টি আমার হাতে। আর এর ধংসও আমার হাতেই। মানুষের জন্ম ও মৃত্যু সব পুননির্ধারিত। তাই তুমি মিথ্যে অশ্রু নষ্ট করছো। তোমার বিবাহ হয়েছে আমার ইচ্ছায়, তোমার সন্তানের জন্ম হয়েছে আমার ইচ্ছায়। আর তাদের মৃত্যুও আমার নির্দেশেই হয়েছে। আজ যে তুমি স্ত্রী ও সন্তান বিয়োগে বিলাপ করছো তার কারণ হচ্ছে মায়া। এই মায়ার বন্ধনে তুমি আবদ্ধ হয়ে বিশ্ব সংসারের নিয়ম ভুলে গিয়েছিল।"

ভগবানের কথায় জ্ঞানবোধ হলো নারদের।।

এটা ছিলো মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার গল্প। যেখানে দেবর্ষিও মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ। আর সেইখানে আমরা তো সাধারণ মানুষ। তাই মৃত্যুকে মেনে নেওয়া আমাদের কাছে অসম্ভব হয়ে ওঠে। যদিও কালের চক্রে সেই মৃত্যুর শোককে পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চলি সম্মুখে।। কিন্তু সেই বিয়োগের যন্ত্রনা কোথাও যেন থেকে যায় মনের অন্দরমহলে।।

অনেককেই হারিয়েছি। কষ্টও পেয়েছি। আবার সেই কষ্টকে ভুলে গা ভাসিয়েছি জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহে। কিন্তু মনের অন্দরে কোনো এক কোঠরে সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষ গুলোর স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে। ভালোবাসা ও মায়া ভগবানের তৈরি এই দুই উৎসেচকের জন্যই আজও মানুষ মানুষের জন্য কাঁদে।

এই স্বল্প জীবনে আমরা এই মায়া ও ভালোবাসার বদলে হিংসা বিবাদ ক্রোধ এইসব উৎসেচককে আপন করে নিয়ে একে অপরকে দূরে সরিয়ে রাখি।

আমরা মূর্খ, আমরা নির্বোধ তাই ভগবানের দেওয়া এই সুন্দর জীবনে ভালোবাসা ও প্রেম নামক উৎসেচককে আমরা আপন করে নিতে পারিনা। আমার তার বদলে হিংসা, বিবাদ, লোভ এই সকল উৎসেচকের পেছনে ঘুরে ঘুরে জীবনের অন্তিমকালে মোক্ষ লাভের আশা করি।

আসুন আমরা সকলে মিলে প্রেম ও ভালোবাসার উৎসেচককে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিই। কারণ জীবনের অন্তিম লগ্নে হিংসা বিবাদ নয় ওই ভালোবাসা মায়াই হবে আমাদের মোক্ষ লাভের পথ।

সূচীপত্র

ছেলেবেলার রেল প্রেম

কৌস্তভ চৌধুরী

প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে তখন সবে হাই স্কুলের সীমানায় প্রবেশ করেছি। শৈশব থেকে কৈশোরে প্রবেশের সন্ধিক্ষণে প্রতিদিন যে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করছি তা বলাই বাহুল্য। সময়ের সাথে সাথে শৈশবের ভালোলাগা কিছু জিনিস যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনই আবার কিছু ভালোলাগা চিরন্তন রয়েগেছে আজও। নতুন বন্ধু, নতুন পরিবেশ সবকিছুর মধ্যেই যেন এক অমোঘ ভালোবাসার ছোঁয়া। ধীরে ধীরে পরিচিত হলাম টিনএজের অদম্য অনুভূতির সাথে, ছোঁয়া পেলাম প্রেমের, আবেগের। কিন্তু আমি মানুষটা যে ব্যতিক্রমী, আমার প্রেম তো চিরাচরিত রক্তমাংসের মানুষের সাথে নয়। আমার প্রেম লৌহশকটের সাথে, যার আর এক নাম কু ঝিক ঝিকের রেলগাড়ি। হারিয়ে যাওয়া শৈশবের স্মৃতিমেদুর রেলপ্রেমেরই কিছু টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতাই না হয় আজ আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম---

আমাদের ছোটবেলায় সেই যে একটা ছোট্ট ছড়া ছিলো না ---
"তাই তাই তাই, মামারবাড়ি যাই,,
মামারবাড়ি ভারি মজা,,
কিল চড় নাই।"

সত্যি! মামারবাড়ি প্রতিটা মানুষের কাছেই সবচেয়ে সুখের, আনন্দের একটা জায়গা। যেখানে গেলেই মন ভরে ওঠে অনাবিল আনন্দে। চরম দুস্টুমী করলেও মায়ের কাছে বকা খাওয়ার কোনো বালাই নেই। খাঁচা থেকে উড়ে যাওয়া পাখি আর আমাতে তখন বিশেষ কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যেত না।
ছোটবেলায় তাই মামারবাড়ি যাওয়ার কথা উঠলেই আমিও আর পাঁচটা কচিকাঁচার মতো আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতাম। অবশ্য এই আনন্দের পেছনে আরেকটি বিশেষ কারণ ছিল, যেটা না বললে এই লেখাটাই অর্থহীন হয়ে পড়বে। আমার মামারবাড়ি যেতে গেলে প্রায় ৪ ঘন্টা ট্রেনে চড়ে যেতে হতো। আশা করি আর কারণ বলতে হবে না, যে কেন আমার আনন্দের মাত্রা দ্বিগুন হতো!

উত্তেজনায় আগের রাত্রে প্রায় ঘুমই হতো না। যাওয়ার দিন খুব ভোর থাকতেই ঘুম থেকে উঠে পড়তাম। জামা প্যান্ট পড়ে তৈরী হয়ে ঠিক ৪:১৫ এর মধ্যে রওনা হয়ে অটোরিক্সা নামক ত্রিচক্র যানে করে পৌঁছে যেতাম স্টেশনে, টিকিট কেটে বাবা মায়ের সাথে পৌঁছাতাম ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে।

-- নাঃ!! ট্রেন এখনো কার্শেড থেকে আসেনি, উফফ বাঁচলাম, নাহলে তো ট্রেনের ওই শানটিং করে প্ল্যাটফর্মে ঢোকাটা দেখাই হতো না। ট্রেন যাত্রার কোনো একটি ক্ষণও মিস করতে চাইতাম না আমি। ঠিক সেই সময় মাইকের গুরুগম্ভীর আওয়াজ জানান দিলো আসানসোল থেকে হাওড়া যাওয়ার আসানসোল এক্সপ্রেস (ওরফে বিধান এক্সপ্রেস/ অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস) তার নির্ধারিত সময়ে সকাল ৫:২০ মিনিটে (বর্তমান সময় সকাল ৫:৩০ মিনিট) ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে।

অধীর আগ্রহে আমার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ট্রেনের আগমনের দিকে। ওই! ওই যে আসছে সাপের মতো এঁকে বেঁকে। এক দৈত্যাকার কালো রঙের কয়লার ইঞ্জিন ভোঁস ভোঁস করতে করতে টেনে আনছে ওই বিশাল লোহার তৈরী বাক্স গুলোকে। চাকা আর লাইনের ঘষা খাওয়ার উফফ সেকি বিকট ঘটাং ঘটাং শব্দ। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো প্রায় প্রতিটি যাত্রীই কানে আঙ্গুল দিতেন তীব্র যান্ত্রিক সেই আওয়াজ থেকে বাঁচার জন্য। কিন্তু আমি! আমি যে ব্যতিক্রমী, আমার দারুন লাগতো সেই সব আওয়াজ। আজও যেন চোখ বুজলে কানে বেজে ওঠে সেইসব মধুর আওয়াজ।

চোখ বন্ধ করে হাতজোড় করে ভগবানের কাছে তখন আমার একটাই প্রার্থনা ছিল, যে ঠাকুর জানলার পাশের সিটটাই যেন পাই।

ট্রেন থামতে দেরী আছে, এর ফাঁকেই বাবা ট্রেনে উঠে জানালার ধারের জায়গা রাখতেন। এরপর উঠতাম আমি আর মা। কেয়া বাত!! আমি এখন বাদশা। জানালার ধারের দুষ্প্রাপ্য জায়গার মালিক এখন আমি, তাও আবার একটা জানালা নয় মুখোমুখি দু'দুটো জানালা। যাই হোক একটা ধন্যবাদ ঠাকুরের অবশ্যই প্রাপ্য। মনে মনেই বলতাম -- Thank You Thakur.....

এবার আমার পরবর্তী মিশন ছিল ইঞ্জিন লাগানো দেখতে যেতে হবে। আমি তো তৈরী, সাথে বাবাও তৈরী, আমাকে নিয়ে এগিয়ে চললো প্রথম বগির কাছে।

আসলে ইঞ্জিন লাগানো (কাপলিং) দেখার আসল উদ্দেশ্য ছিলো, ইঞ্জিনের রং দেখা। ওই সময় লাল ও সবুজ এই দুই ধরণের ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন দেখা যেত। লাল রঙের ইঞ্জিন (WAP4) ছিলো আমার কাছে স্বপ্নের পক্ষীরাজ। ওই লাল ইঞ্জিন ওই সময় ভারতীয় রেলের এলিট শ্রেণীর ট্রেন রাজধানী এক্সপ্রেস টানার দায়িত্বে থাকতো। সবুজ রঙের ইঞ্জিন (WAM1) ভালো হলেও আমার কাছে ছিলো সাধারণ টাট্টু ঘোড়া।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য WAP4 এর অর্থ হচ্ছে Wide/ Broad Gauge AC Electric Passenger Class 4.

আর WAM1 এর অর্থ হচ্ছে Wide/ Broad Gauge AC Electric Multiple/ Passenger & Goods Class 1.

সবচেয়ে মজার ব্যাপার ওই কৈশোর বয়সে এই সব অর্থ আমার কাছে অজানা ছিলো। বুঝতাম একটাই সহজ হিসেব, সবুজ ইঞ্জিন ধীরে চলে আর লাল ইঞ্জিন চলে রকেটের মতো।

বাবা সিগন্যাল হয়েছে গো?? গার্ড বাঁশি বাজালো?? আর সবুজ পতাকা দেখালো ড্রাইভারকে?? ঐতো, ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে আওয়াজ আসছে, পুঁ...পুঁ... গাড়ী দুলে উঠলো আর আমি জানালার বাইরের দৃশ্য গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলাম। বাবা ওই দেখো একটা হলুদ আলো জ্বলছে, তারমানে ট্রেন খুব আস্তে আস্তে যাবে এখন,,তাই না বাবা?? আসানসোল থেকে হাওড়া যাওয়ার পুরো রাস্তায় আমার এইরকম বহু প্রশ্নের উত্তর ছিলো আমার বাবার কাছে।

যখন ছোট ছিলাম তখন প্রতিদিন বিকেল বেলায় খুব অদ্ভুত একটা আবদার করতাম বাবার কাছে, বাবা ট্রেন দেখতে যাবো। বাবাও অফিস থেকে ফিরে এসে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত ট্রেন দেখাতে। বাড়ির খুব কাছেই ছিলো রেলের ট্র্যাক। BNR (Bengal Nagpur Railway) এর আসানসোল আদ্রা শাখার ট্রেন যেত ওই পথে। বাবার হাত ধরে যেতাম সেই ট্রেন দেখতে,, এক অনাবিল আনন্দে নেচে উঠতো মন। আজ এত বড়ো হলেও ট্রেন দেখে সেই একই রকম আনন্দ আজও অনুভব করি।

বাবার হাত ধরে শেখা সেই রেল ভালোবাসা সময়ের সাথে সাথে রূপ নিয়েছে রেল উন্মাদকতায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমার দুই জ্যাঠামশাই, আমার পিসেমশাই, আমার দুই দাদা এবং আমার এক জামাইবাবু কর্মসূত্রে রেলে ছিলেন, যার মধ্যে আমার বড়ো জ্যাঠামশাই আবার ছিলেন লোকো-পাইলট। তাই বাড়িতেও রেলের একটা পরিবেশ সবসময় থাকতো। ধানবাদে একান্নবর্তী পরিবারে থাকাকালীন বড়ো জ্যাঠাইমা রাত্রি সাড়ে নয়টায় আমাদের ভাই বোনদের খেতে ডাকতেন। আর বলতেন কোলফিল্ড ঢুকে গেছে রে, এইবার খেতে আয়। তাই পারিপার্শ্বিক রেলের এই পরিবেশ আমার রেল প্রেমের অনুঘটক হিসেবে যে কতটা মুখ্য কাজ করেছিলো তার প্রমাণ আমি এই বয়সে এসে খুব ভালো টের পাচ্ছি।

যাইহোক যে কথাটা বলছিলাম, সেই ছোট্ট থেকেই ধীরে ধীরে মনের কোণে বেড়েছে রেলের প্রতি আসক্তি। ধানবাদের কাছেই ভুলি বলে একটি ছোট্ট স্টেশন আছে, যেখানে রেলের একটি ট্রেনিং স্কুল আছে সেই ট্রেনিং স্কুলের সাথে লাগোয়া অনেক রেল-কোয়ার্টার আছে, সেইখানে আমার মেজো জ্যাঠামশাই থাকতেন। আমরাও প্রায়ই যেতাম সেখানে বেড়াতে। তাই খুব সহজেই নাগাল পেয়ে যেতাম আমার নেশার। যদিও এই পাগলামির জন্য মায়ের কাছে যথেষ্ট বকা শুনতে হোতো।।

ভুলিতে থাকাকালীন প্রতিদিন সন্ধ্যে ৭:৩০ মিনিটে আমি বাড়ীর পেছনের আগাছাপূর্ণ প্রায় জঙ্গল হয়ে যাওয়া দরজাটা খুলে তাকিয়ে থাকতাম রেল ট্র্যাকের দিকে। ভয় লাগতো এত অন্ধকার দেখে। তবু ট্রেন দেখার নেশায় জয় করতাম মনের অন্তরমহলে তৈরী হওয়া সকল ভূত-পেত্নীর অশনি ছায়াকে।

..... নজর থাকত লাল হয়ে থাকা দূরের ওই আলোটার দিকে, ভাবতাম কখন ওটা সবুজ হবে কখন দূর থেকে ইঞ্জিনের সেই পুঁ...পুঁ...পুঁ আওয়াজটা শুনতে পাবো, উত্তেজনায় হাত-পা কেমন যেন শিথিল হয়ে আসতো,, অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ওই দূরের লাল আলো সবুজ হোতো, আর শুনতে পেতাম সেই বহু কাঙ্খিত আওয়াজ পুঁ...পুঁ...পুঁ...,, বন্ধুরা বুঝতে পারছো কি, কে আসছে?? আমাদের সবার প্রিয় ER KING with old ICF traditional livery.......। হ্যাঁ! সঠিক ধরেছো- ট্র্যাক কাঁপিয়ে নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে যেত হাওড়া - নতুন দিল্লী রাজধানী এক্সপ্রেস। ওই বয়সে ICF, livery এইসব বেশীরভাগ কথার অর্থই ছিল আমার কাছে আকাশগঙ্গা ছায়াপথের মতো। কিন্তু তাই বলে তো প্রেম দমানো যায় না।

ওই যে একটা জনপ্রিয় হিন্দি গানের বুলি আছে না!! ---- "জব প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া"!

আরেকটি ঘটনা বলি, তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি, বর্ধমান থেকে আসানসোল ফিরছি সকালের রাঁচি হাটিয়া প্যাসেঞ্জারে, স্বভাব অনুযায়ী বাবার হাত ধরে পোঁছে গেছি আমার সেই সবুজ ইঞ্জিন বগির সাথে লাগানো দেখতে, তখন সেটাই জানতাম না যে কোনটাকে বগি বলে আর কোনটাকে কোচ ,, ধুর!! নাই বা জানলাম!! ভালোবাসতে গেলে অতো শত জেনে তারপর ভালোবাসা যায়না,, ট্রেন ভালো লাগে এটাই আমার কাছে প্রধান বিষয়। যাইহোক বক্তব্যে ফিরে আসি-- অবাক হয়ে দেখছি ইঞ্জিনের বগির সাথে যুক্ত হওয়া আর প্রশ্নের বাণে জর্জরিত করছি পিতৃদেবকে, বাবা কোনোদিনই বিরক্ত হতেন না, খুব যত্নসহকারে আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতেন, আমার প্রশ্ন শুনে লোকো-পাইলট আমাকে কাছে ডেকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, বললাম আমার নাম কৌস্তভ। এরপর যেটা বললেন সেটা শুনে আমি তো হতবাক হয়ে গেলাম, ভাবছি এইটা কি সত্যি নাকি স্বপ্ন? উনি আমাকে ইঞ্জিনে চাপতে চাই কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই উনি আমাকে কোলে তুলে চেপে গেলেন, সেই সবুজ ইঞ্জিনটায় ঘুরে ঘুরে আমাকে অনেক কিছু দেখালেন, যার একশো শতাংশ বোঝার মতো বয়স আমার তখন ছিলনা, যাইহোক বহুকাঙ্খিত ছিল ট্রেনের হর্ন বাজাবো, কিন্তু গায়ে এতটাও শক্তি তখন ছিল না যে ঐ লিভার চিপে হর্নটা বাজাবো। উনি আমাকে সাহায্য করলেন হর্ন বাজাতে। আর আমার উৎফুল্লতা সেটা আশাকরি আমার প্রিয় রেলপ্রেমী ভাইদের আলাদা করে আর বোঝাতে হবে না।।

ভুলির খুব কাছেই ছিল আরেকটি স্টেশন নাম কুসুনডা। এই স্টেশনটি ধানবাদ-চন্দ্রপুরা সেকশনে অবস্থিত (যেটিতে ট্রেন চলাচল রেল কর্তৃপক্ষ ২০১৭ সালে বন্ধ করে দিয়েছিলো, বর্তমানে ২০১৯ সালে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। তবে গতি বিষয়ক চরমতম সতর্কতা অবলম্বন করে), সেই স্টেশনে নেমেও ভুলি আসা যেত। কাত্রাসগড় থেকে ধানবাদ পর্যন্ত দুইটি বগি নিয়ে একটি কয়লার ইঞ্জিনে টানা ট্রেন চলতো যার নাম ছিল "স্টাফ"। এই রকম নাম হওয়ার কারণ হলো এই ট্রেনটি সমস্ত যাত্রীদের সকালে ধানবাদ থেকে কোলফিল্ড ধরাতো আবার ব্ল্যাকডায়মন্ড ধানবাদ পৌঁছালে তার যাত্রীদের নিয়ে কাত্রাসগড় ফিরে আসতো, পুনরায় বিকেলে হাওড়া যাওয়ার ব্ল্যাকডায়মন্ড ধরিয়ে

রাতের কোলফিল্ডের যাত্রীদের নিয়ে ফিরে আসতো, অনেক অফিস যাত্রী এই ট্রেনটিতে করেই ধানবাদ গিয়ে নিজের নিজের কর্মস্থলে যেতেন, তাই এইরকম নামকরণ করা হয়েছিলো।

আমি অনেকবার ব্ল্যাকডায়মন্ডে ধানবাদ পৌঁছে এই স্টাফ ট্রেনে চেপেই কুসুনডায় নেমে ভুলি যেতাম, আর এই অল্প সময়ের যাত্রাপথ আমার কাছে ছিল রূপকথার মতো, ট্রেনের জানালার কোনো গ্রিল ছিলো না, তাই মাথা বার করে এঁকে বেঁকে চলা এই দৈর্ঘ্যে ছোট্ট ট্রেনটার যাত্রা উপভোগ করতাম। কয়লার গুঁড়ো উড়ে এসে চোখে মুখে পড়তো, তাতে কি আসে যায়? ওই যে!! সে চলেছে!! কুউউ.....কুউউ ঝিক ঝিক ঝিক...... উফফ মনটা খুশীতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতো।।

ছোট্ট আরেকটি স্মৃতি কথা বলে এই লেখাটি শেষ করছি। মায়ের কাছে রোজ আব্দার করতাম যেন স্ট্রাইপ দেওয়া চাদর বিছানায় পাতে, কারণ ওই স্ট্রাইপ গুলো ছিল আমার কল্পনার রেলের ট্র্যাক, বাবা আমাকে Plastic Town নামের একটা বিশেষ খেলনা কিনে দিয়েছিলেন, যেটা দিয়ে বিভিন্ন রকমের বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদির মডেল বানানো যেত। আমি সেইটা দিয়ে বানাতাম বিধান এক্সপ্রেস, কোলফিল্ড এক্সপ্রেস, ব্ল্যাকডায়মন্ড এক্সপ্রেস, তো আবার কখনো কখনো রাঁচি হাটিয়া প্যাসেঞ্জার, আবার কখনো আসানসোল আদ্রা লোকাল। দাবা ও লুডোর বোর্ড ছিল প্ল্যাটফর্ম, পেন্সিল কাটার শার্পনার ছিল সিগনাল, পেন্সিল ছিল লেভেল ক্রসিং গেট, আর ট্রেনের চলার আওয়াজ....... আমার নিজের মুখের আওয়াজই জিন্দাবাদ,, মুখেই আওয়াজ তৈরী করে ফেলতাম। ট্রেন ছাড়ার হর্ন, মাইকের ঘোষণা, লাইনের ক্রসিংয়ের আওয়াজ, ব্রেক কষে ট্রেন দাঁড় করানোর আওয়াজ সবই মজুত ছিল। ঘটনা গুলো ভাবলে এখন হাসি পায়।

বর্তমানে ব্যস্ততার এই জীবনের ফাঁকেই কোনো কোনো সময় মনের পর্দায় ভেসে ওঠে শৈশবের রেলের স্মৃতিজড়িত সেইসব কাহিনী। প্রাণপণ ইচ্ছে করে ফিরে যেতে হারানো সেই ছেলেবেলায়....। কিন্তু সময়ের চাইতে তো কেউ বেশি শক্তিশালী নয়, এই সত্যটা তো মানতেই হবে। অবুঝ মনকে তাই বোঝাই ছেলেবেলায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এই বয়সেও রেল পাগলামী সম্ভব। রেল প্রেম যে আমার রক্তে, আমার অস্থি মজ্জায়, আমার মানসিকতায়। তাকে তো ছেড়ে থাকতে পারি না। তাহলে যে আমার জীবনটাই অসম্পূর্ণ।

সূচীপত্র

একই ফ্রেমে এবং একই ট্র্যাকে রাজা ও রানী পরপর।
স্থান :- মধুসূদনপুর, হাওড়া বর্ধমান কর্ড সেকশন।

রাজা - হাওড়া রাজধানী (প্রথমে)
রানী - শিয়ালদহ রাজধানী (পেছনে)

প্রকৃতির রানী অসম : রেল-ভ্রমণ

কৌস্তভ চৌধুরী

"অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব ১২০৬৭ উজনিম গুৱাহাটী যোৰহাট টাউন জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ ক্ষন্তেক পিছতে ৩ নম্বৰ প্লটফৰ্মৰ পৰা এৰিব"

(অনুগ্রহ করে শুনবেন ১২০৬৭ আপ গুয়াহাটি যোরহাট টাউন জনশতব্দী এক্সপ্রেস কিছুক্ষন পরেই ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে)

নির্ধারিত সময়েই গুয়াহাটি থেকে আমাদের ট্রেন ছাড়ল, সকাল ৬ টা বেজে ৩০ মিনিটে। গন্তব্য আপার অসমের যোরহাট, আসামের একটি জেলা তথা জেলা সদর।

অসমের সংস্কৃতিকে চিনতে ও জানতে চাইলে শুধুমাত্র গুয়াহাটি শহরে বিচরণ করলেই হবে না, সেই সংস্কৃতির খোঁজে যেতে হবে অসম রাজ্যের অনেক গভীরে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভারে ভরা এই রাজ্য। আর এইরকমই এক নৈসর্গিক প্রকৃতির খোঁজে, অসমের সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করতে রওনা দিলাম অসমের আরো গভীরে।

আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম দরজার কাছে, প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আমাদের ট্রেন এঁকে বেঁকে এগোতে থাকলো তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। দরজা দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলে আসা গুয়াহাটি স্টেশনের দিকে তাকিয়ে তাকে বিদায় জানাচ্ছিলাম। গুয়াহাটি স্টেশনের রেক ইয়ার্ড ও লোকো শেড একদম পাশাপাশি (নিউ গুয়াহাটি), ডান দিকে সেই ইয়ার্ড ও শেডকে রেখে আমাদের জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে এগিয়ে চলেছিল। বামদিকে তাকাতেই নজরে এলো সেই বহু স্মৃতি জড়িত অসমের প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্র। গুয়াহাটি ছাড়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই কোথায় যেন হারিয়ে গেলো সেই বিশাল জনপদ, মানুষের কোলাহল, বড়ো বড়ো প্রাসাদ সমান বাড়ি। চোখের সামনে এখন শুধুই সবুজ আর সবুজ। সেই সবুজের ফাঁকেই মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে ব্রহ্মপুত্র। আমরা চলেছি এই ব্রহ্মপুত্রের বুকেই অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় নদী বক্ষের দ্বীপ মাজুলির উদ্দেশ্যে।

পাহাড়ি রাস্তায় প্রায় ১০০ কিমি গতিবেগে পাড়ি দিচ্ছে গুয়াহাটি থেকে যোরহাট টাউন যাওয়ার ১২০৬৭ আপ জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। টেনে নিয়ে চলেছে ভারতীয় রেলের শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিন ডব্লিউ.ডি.পি -৪ডি। ট্রেনের অন্দরের সাজসজ্জা যথেষ্ট নজরকাড়ার মতো, অসমের সংস্কৃতি বিহু নাচের ছবি ও বিশেষ কিছু দর্শনীয় স্থানের যেমন- মা কামাখ্যা মন্দির, কাঞ্জিরাঙা জঙ্গল, চা-বাগান, গন্ডারের বেশ কিছু ফ্রেমে বাঁধানো ছবি স্থান পেয়েছে ট্রেনের কামরার ভেতরে।
ডান দিকে সুউচ্চ পাহাড় ও বাম দিকে ব্রহ্মপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রকৃতির বুক চিরে এগিয়ে চলেছে ট্রেন।
বেশ কিছু ছোটো ছোটো স্টেশন নুনমাটি, নারঙ্গি, পানিখাইতি, পানবাড়ী, কামরূপ খেত্রী ইত্যাদিকে পেছনে ফেলে ট্রেন তার যাত্রা পথের প্রথম বিরতি দিলো চাপরমুখ জংশনে। শিলঘাট টাউন যাওয়ার ট্রেন এইখান থেকেই পাওয়া যায়। আলিপুরদুয়ার থেকে শিলঘাট

টাউন যাওয়ার "রাজ্যরানী এক্সপ্রেস" এই স্টেশন হয়েই নগাঁও এর দিকে ঘুরে যায়। স্টেশনটি খুব বড়ো না হলেও বেশ জনমানবপূর্ণ। স্টেশনটিতে বিক্রিত দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ আকর্শন ছিল কল, এবং রবাব ট্যাঙ্গা। কাতি (কার্ত্তিক মাসে এই উৎসব হয় বলে এইরূপ নামকরণ) বিহু উপলক্ষে রবাব ট্যাঙ্গার চাহিদা খুব বেশী, কারণ অসমের উৎসব কাতি বিহুতে রবাব ট্যাঙ্গা একটি অপরিহার্য ফল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অসমীয়া ভাষায় "কলা" কে বলে "কল" এবং "বাতাবি লেবু" কে বলে "রবাব ট্যাঙ্গা"। ট্রেন ছাড়লো, পরবর্তী স্টপেজ হোজাই।

চাপরমুখ জংশন থেকে ট্রেন ছেড়ে এগিয়ে চলেছে হোজাই এর দিকে।
আমি বেশ অনেকক্ষন ধরেই ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ছবি তোলার অপেক্ষায় রয়েছি, কিন্তু ঠিক সুযোগ হয়ে উঠছিল না। বোরো জঙ্গীদের উৎপাতের জন্য এই রেলযাত্রায় রেলপুলিশের টহলদারীটা একটু মাত্রাতিরিক্ত। রেলপুলিশদের কড়া চোখের শাসন আমায় বুঝিয়ে দিল আমি যেন কোনো ভাবেই ছবি তোলার সাহস না দেখাই, অগত্যা ক্যামেরাটা খোলসে পুরে আর চোখকেই লেন্স করে মনের হার্ডডিস্কে স্টোর করছিলাম প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের ক্যানভাস।
শরতের নীল আকাশে পেঁজাতুলোর মতো মেঘ, সাথে সবুজের সমারোহ - ঈশ্বর এখানে দুহাতে ঢেলে সাজিয়েছেন প্রকৃতিকে। এখানকার আকাশ ঘন ঘন তার রূপ পরিবর্তন করে চলেছে। সবুজেরও এখানে রঙের বাহার, কোথাও গাঢ় তো কোথাও হালকা আবার কোথাও সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে হালকা হলুদের ছোঁয়া। সত্যি কথা বলতে কি এই রূপ মাধুর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা বড়ই কঠিন।

অসমের এই অপরূপ প্রকৃতির প্রতি আমার বরাবরই একটা দুর্বলতা আছে, অসমের ভাষা, অসমের সংস্কৃতি সবকিছুই আমাকে ভীষণ রকম আকৃষ্ট করে, মনে হয় কোথায় যেন এক অদৃশ্য বন্ধন রয়েছে। এখানকার প্রকৃতি ও মানুষের ব্যবহারে পূর্ববঙ্গের (আমার প্রিয় বাংলাদেশ) একটা ছোঁয়া পাওয়া যায়। এখানকার আকাশে বাতাসে এক গভীর ভালোবাসা আছে, আমি সত্যি সেটা অনুভব করি।
বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে আর যথারীতি আমার পেটে ছুঁচোর ডন বৈঠক শুরু হয়ে গেছে,

ট্রেনটিতে প্যানট্রি কার নেই কিন্তু অনবোর্ড প্যানট্রি আছে, সেখান থেকেই কিনে ফেললাম ব্রেড-ওমলেট-কাটলেট। উফফ, গরম গরম ওমলেট ও কাটলেট ব্রেডের সাথে, কি যে সুস্বাদু সে আর কি বলবো! সাথে আবার "গরমা গরম চায়ে"। আসলে ভ্রমণ মানেই বাঙালী, আর বাঙালী মানেই ভোজন, তাই যেখানে বাঙালী থাকবে সেখানে ভ্রমণ ও ভোজন থাকবে না তাই আবার হয় নাকি?

খাওয়া দাওয়া সারতে সারতেই পৌঁছে গেলাম হোজাই। চারিদিকে বিস্তীর্ন প্রান্তরের মাঝে ছোট্টো একটি স্টেশন। এখানে বিক্রিত দ্রব্যাদির মধ্যে অন্যতম হোলো মৎস্য, আজ্ঞে হ্যাঁ সবাই ঠিকই বুঝেছেন আপামর বাঙালীর প্রিয় খাদ্য মাছ। বালতিতে জলের মধ্যে মাছ নিয়ে হকারেরা ট্রেনে উঠে মাছ বিক্রিতে ব্যাস্ত, ক্রেতাদের মধ্যে যেমন সাধারণ যাত্রীরা আছেন ঠিক সেইরকমই রয়েছেন রেলপুলিশ, টিকিট পরীক্ষক এবং লোকোপাইলট। লোকোপাইলট তো রীতিমত দরদাম করে কিনে ফেললেন ২ কেজি মাছ। ট্রেন ছেড়ে আবার স্বমহিমায় গতি চরমে তুলে চড়তে শুরু করলো পাহাড়ে।
পাহাড় খুব উঁচু না হলেও এখানে পথ যথেষ্ট চড়াই উৎরাই, পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ- কোথাও পাইন, কোথাও ফার্নের জঙ্গল কোথাও আবার গোলমরিচের লতানো গাছ কোনো এক বৃহৎ বৃক্ষকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, আবার কোথাও শুধুই নাম না জানা গাছের গভীর জঙ্গল।
আবার কেমন যেন খিদে খিদে পাচ্ছে, সাথেই ছিল কেক ও ম্যাংগো জুস, কিছুটা পেট পুরে পেটটাকে শান্ত করলাম। আসলে ট্রেন যাত্রা আর তার সাথে টুকটাক খাওয়া না হলে কি চলে? ট্রেন যেমন চলছে ঠিক সেইরকমই মুখটাকেও চালাতে হবে। ট্রেনে হকারদের আনাগোনা চলছে, যারমধ্যে প্রধান হোলো অসমের পান-তাম্বুল(সুপারি)। সাথে মশলা মুড়ি, ডিম সিদ্ধ ইত্যাদিও মজুত। গোটা কয়েক ডিম সিদ্ধও গলাধঃকরণ করলাম, তবে পান-তাম্বুল খাওয়ার সাহস হোলো না, পাছে মাথা ঘুরে বমি হয়। বাইরের হাওয়াটাও যথেষ্ট আরামদায়ক, বেশ একটা ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজ। ট্রেন গোটা যাত্রাপথে খুব কম সময় সোজা পথে চলে, না হলে বাকি পথে লোকোপাইলট কখনোই সোজা তাকিয়ে থাকতে পারেন না। পুরো রাস্তাটাতেই জঙ্গলের ভেতরে পাহাড়ের গায়ে এঁকে বেঁকে সরীসৃপের মতো এগিয়ে চলেছে জনশতাব্দী।

এরই ফাঁকে রেলপুলিশের চোখ এড়িয়ে চলভাষ যন্ত্রে কয়েকটা বাইরের অপরূপ মুহূর্ত খিঁচিক করে রেখেছি।
পরের স্টপেজ লংকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নেই, আর পাঁচটা ছোটো স্টেশনের মধ্যেই একটু বড়ো স্টেশন। ট্রেন ছেড়ে এগিয়ে চললো পরবর্তী স্টপেজের দিকে।
ট্রেন এসে পৌছালো লামডিং জংশনে। এই পথের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জংশন স্টেশন এটি। লামডিং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিভিশন। মোট ৫ টি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে এই জংশন স্টেশনটিতে। আগরতলা এবং শিলচর যাওয়ার জন্য এইখানেই ট্রেন বদল করতে হয়, যদিও কলকাতা / দিল্লী প্রভৃতি জায়গা থেকে সরাসরি আগরতলা ও শিলচর যাওয়ার ট্রেন বর্তমানে হয়েছে। স্টেশনটি যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখান থেকে ট্রেনে বেশ ভালোই লোকজনের ভীড় হোলো। ট্রেনের সমস্ত কামরাই সংরক্ষিত, তথাপি ট্রেনে বেশ উটকো লোকের ভীড় লক্ষ্য করা যায়। এই রেলপথে পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্রেন না থাকার দরুণ, এক্সপ্রেস ট্রেনের সংরক্ষিত কামরায় যাত্রা করা ছাড়া এইসব মানুষগুলোর আর কোনো উপায় নেই। তাই টিকিট পরীক্ষকরাও ওইসব মানুষ গুলোর কথা চিন্তা করে সব দেখেও না দেখার ভান করে থাকেন।
বেশ কিছু স্থানীয় সুস্বাদু খাবার নিয়ে হকাররা এখন থেকে ট্রেনে উঠলো, যার মধ্যে প্রধান ছিল পুরী-সব্জী এবং ছোলা মাখা। ছোটো ছোটো শালপাতার বাটিতে ছোটো ছোটো পুরী ৪ পিস করে আর সাথে সব্জী, পেঁয়াজ, বাঁশের আচার-- আহা মুখে স্বাদটা এখনো লেগে আছে। লোভে পড়ে আমি দু প্লেট খেয়েই নিলাম। সাথে ছিল ছোলা মাখা, মানে আগের দিন রাত্রের জলে ভিজিয়ে রাখা ছোলা গরম করে মশলা, পেঁয়াজ ও লেবু সহকারে মেখে শালপাতায় পরিবেশন। পেট ভর্তি কিন্তু মন যে নয়, ভাবছি খাবো কিনা!!! সাধও করে আবার মনও পোড়ে, তাই আর বেশী চিন্তা ভাবনা না করে ১০টি টাকা বার করে কিনেই ফেললাম, একটু মুখে পুড়ে স্বাদ আস্বাদন করে বুঝলাম ১০টি টাকা জলে যায়নি। এই ট্রেন যাত্রায় খাদ্য রসিক বাঙালীদের মুখ নাড়ানোর কোনো সমস্যা হবে না। সেইসব খাবার খেতে খেতেই ট্রেনের যাত্রা উপভোগ করছিলাম। সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে প্রচুর নাগা ও মনিপুরী যাত্রীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ছোট্ট নাগা ও মনিপুরী শিশুর নিষ্পাপ মুখ ভোলার নয়। পাহাড় শেষে এখানে বেশ কিছু ধানি জমি চোখে পড়লো।

লামডিং এর পরবর্তী স্টেশন দিফু। নিতান্তই ক্ষুদ্র একটি স্টেশন তথাপি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপেজ এইখানে রয়েছে। স্টেশন ক্ষুদ্র হলেও জায়গার গুরুত্ব যথেষ্ট, এইখান থেকেই নগাঁও এবং ডিমাপুর হয়ে নুমিলীগড় যাওয়ার সড়ক যোগাযোগ আছে, এইখান থেকে ১২৯ নম্বর জাতীয় সড়কের রাস্তা ধরে খুব সহজেই নাগাল্যান্ডে পৌঁছনো যায়। দিফু থেকে ট্রেন ছেড়ে এগিয়ে চললো গন্তব্যের দিকে, আমরাও এবার অসম রাজ্য ছেড়ে প্রবেশ করলাম ভারতের আরেক রাজ্য নাগাল্যান্ডে।

আমরা এখন ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে আনুমানিক ১৫০ কিমি দূরত্ব বজায় রেখে চলেছি। ব্রহ্মপুত্র এবং আমাদের রেল পথের মাঝে রয়েছে বিশ্ব বিখ্যাত কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান। গুয়াহাটি থেকে যোরহাট যাওয়ার সড়ক পথ কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়েই গেছে, সড়ক যাত্রায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে অনেক সময় দেখা মেলে কাজিরাঙার বন্য প্রাণীদের। এছাড়াও রয়েছে অসমের স্বতন্ত্র জেলা কারবি আঁলং (কাৰবি আলং), "কারবি" বলা হয় অসমের একধরনের আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষদের আর "আঁলং" কথার অর্থ পাহাড়। এই কারবি আঁলং অঞ্চলটি বিশ্বের উৎকৃষ্ট মানের জৈব আদা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

"অনুগ্রহ কৰি মন কৰিব ১২০৬৭ উজনিম গুৱাহাটী যোৰহাট টাউন জনশতাব্দী এক্সপ্রেছ ৰেলগাড়ী খন এতিয়া ১ নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা ৰৈয়াসে"- খুবই কৌতূহলী ছিলাম যে ডিমাপুর স্টেশনের মাইকের ঘোষণা কিরকম হবে? লক্ষ্য করলাম এখানেও ঘোষণার সময় আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে অসমীয়া ভাষাকেই ব্যবহার করা হয়।

খুব বড়ো না হলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ডিমাপুর। নাগাল্যান্ড বলতে আমাদের মনে প্রথমেই যে ছবিটি ভেসে ওঠে সেটা হোলো আদিবাসী-পাহাড়-জঙ্গল। কিন্তু ডিমাপুর একেবারেই সেইরকম নয়। যথেষ্ট সাজানো গোছানো আর পাঁচটা বড় শহরের মতোই একটি জনবহুল শহর এই ডিমাপুর। এইটি পূর্বে নাগাল্যান্ডের রাজধানীও ছিল।

নাগাল্যান্ড রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন এই রাজ্যে রেল পথের বিস্তার খুবই কম, তাই সবে ধন নীল মণি এই ডিমাপুর স্টেশন। স্টেশন যথেষ্ট ঘিঞ্জি ও অপরিচ্ছন্ন কিন্তু স্টেশন সংলগ্ন রেলের ছোটো ছোটো কোয়ার্টার গুলো খুবই চোখে পরার মতো, ফুলের বাগান সহ বেশ সাজানো গোছানো। স্টেশনের রেল লাইনের গায়েই লাগানো সব্জী

বাজার। সেই বাজারে বিভিন্ন ধরনের সব্জীর মধ্যে মাশরুম, স্কোয়াশ, ছোটো ছোটো আলু অনেকটা রাজমার মতো দেখতে, গাঁঠি কচু এইসব বেশ জনপ্রিয়।

ট্রেন পুনরায় সঠিক সময় সারণী মেনে তার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলো, কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর প্রকৃতির আরেক নতুন রূপের সাথে পরিচিত হলাম, চোখের সামনে সবুজ ধানক্ষেত আর তারপরেই মেঘে ঢাকা সুউচ্চ পর্বত। সেই পর্বতের শিখর যেন চুম্বন করছে ওই নীল দিগন্তকে। এই অপরূপ রূপ মাধুর্য্য দেখে আমারও কবির ভাষায় গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করলো

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার,
কোথায় এমন ধুম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিত ক্ষেত্র,
আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায়,
বাতাস কাহার দেশে।

সত্যিই সহস্র প্রদীপ হাতে নিয়ে খুঁজলেও আমার দেশের মতো আরেকটি দেশ কোথাও পাওয়া যাবেনা। আমার দেশ আমার জন্মভূমি সে সত্যিই সকল দেশের রানী।

পরবর্তী স্টপেজ বোকাজান। এই স্টেশনটি অসম রাজ্যে অবস্থিত এবং বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চল। এর মধ্যেই আমাদের ট্রেন নাগাল্যান্ড ছেড়ে পুনরায় অসম রাজ্যে প্রবেশ করেছে। বোকাজান স্টেশনে নেমে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় নাম্বর রিজার্ভ ফরেস্টে, অসমীয়া ভাষায় যাকে বলে নাম্বর-হাবি-- "হাবি" শব্দের অর্থ "জঙ্গল"।

মা দুর্গার পবিত্র মন্দির দেব পানি (দেৱ পানি) যেতে গেলে বোকাজান স্টেশনে নেমেই যেতে হয়, কথিত আছে চা বাগানের মধ্যে ১৯২৭ সালে তৈরী হওয়া এই মন্দিরটি খুবই জাগ্রত। এই স্থানে পবিত্র মনে মনস্কামনা জানিয়ে মায়ের আরাধনা করলে, মা নাকি তাঁর কোনো ভক্তকেই নিরাশ করেন না।

বোকাজানের পরের স্টপেজ ফারকাটিং জংশন। বোকাজান থেকে ফারকাটিং পর্যন্ত ট্রেন গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়েই যাত্রা করলো, এবং পথে এলিফ্যান্ট করিডোরও চোখে পড়লো, ফলে এইখানে ট্রেনের গতি ৩০ কিমি প্রতি ঘন্টায় বেঁধে দেওয়া আছে।

এইখানে ক্রসিংয়ের জন্য ট্রেন অনেকখন দাঁড়ালো। স্টেশনটিতে দুইটি মাত্র প্ল্যাটফর্ম, আমাদের জনশতাব্দী এক্সপ্রেসকে প্ল্যাটফর্ম বিহীন একটি লুপ লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখে দিলো।

এইখানে নিউ তিনসুকিয়া-রঙ্গিয়া এক্সপ্রেসের সাথে ক্রসিং হোলো আমাদের ট্রেনের। সিঙ্গেল লাইনের জন্য এই যাত্রাপথের অনেক স্টেশনেই ক্রসিংয়ের জন্য বিলম্ব হয়। ফারকাটিং থেকে একটি রেল পথ আলাদা হয়ে গোলাঘাট, নুমিলীগড়, যোরহাট টাউনের পথে ঘুরে মরিয়ানী জংশনে গেছে, আর প্রধান রেল পথটি সরাসরি মরিয়ানী জংশনে গেছে।

এই ফারকাটিং স্টেশনে হঠাৎ করে লক্ষ্য করলাম রেলপুলিশরা প্রতিটি কামরায় উঠে খানা তল্লাশি চালাচ্ছে, বেশ কিছু যাত্রীদের ব্যাগপত্র নেড়েচেড়ে দেখছে, অনেক যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদও করছে, তবে আমরা যারা টুরিস্ট ছিলাম তাদের কাওকেই ওনারা বিরক্ত করেননি। কয়েকজন সন্দেহ জনক মানুষকে ট্রেন থেকে ওঁরা নামিয়ে নিলো!

সন্দেহ জনক মানুষগুলোকে কেন ট্রেন থেকে নামালো অথবা এরপর ওদের নিয়ে কি করবে জানা নেই?! আমার কৌতূহলী মনে হাজার প্রশ্নের ঝড় উঠলো।

ট্রেন ছেড়ে দিলো। আমি বেশ কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকলাম ধরা পড়া সেইসব মানুষগুলোর মুখের দিকে। ট্রেন ডান দিকে বাঁক নিয়ে গতি বাড়াতেই আস্তে আস্তে আবছা হয়ে এলো সেই সব মুখ। বাতাসে ডিজেলের পোড়া গন্ধ - আকাশে ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া, হঠাৎ করে এই সুন্দর মনোরম পরিবেশটাকে কিরকম যেন একটা গুমোট করে তুলেছিল।

বাকী রাস্তায় আমার অনেকবার ওইসব মানুষ গুলির মুখ মনে পড়ছিল যাদের পুলিশ ধরপাকড় করেছিল। মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করা উত্তেজনাকে আর চেপে না রেখে কর্মরত একজন মহিলা রেলপুলিশ কর্মীকে ওই সব ধরা পড়া মানুষগুলোর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম। উনি জানালেন এই অঞ্চলটাতে ভীষণ রকম বোরো জঙ্গীদের উৎপাত, তাই কোনো রকম সন্দেহ জনক কাউকে দেখলেই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

হঠাৎ করে মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেলো, ভাবছিলাম কারা এই বোরো জঙ্গী? কেনই বা এরা এই সুন্দর দেশ অসমটাকে অশান্ত করে তুলেছে? কেন তারা অসম থেকে আলাদা হতে চায়? কেনই বা তারা এই সুন্দর প্রকৃতির রানীকে ভেঙে আলাদা রাজ্য করতে চায়? অসম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম, মেঘলায় কেন এই সব রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে? এরা কি সত্যি বোঝে না প্রকৃতির আর্তনাদ!! প্রকৃতি যে চিৎকার করে বলছে আমাকে রক্তাক্ত কোরো না, আমি আর এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। ঈশ্বরের এই অপার সৃষ্টি, সেটা ধ্বংস করার অধিকার আমাদের কারোর নেই। অসম একা এতটা সুন্দর হতে পারবে না, যতক্ষণ না লোয়ার অসম, আপার অসম ও বোরোল্যান্ড একত্রিত হয়ে অসমরাজ্য না হবে।

এইসব ভাবতে ভাবতেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে ট্রেন পৌঁছালো তার গন্তব্যের শেষ পর্যায়ে, স্টেশনের নাম মরিয়ানী জংশন।

এই সেকশনের আরো একটি বড়ো জংশন স্টেশন, তিনসুকিয়া হয়ে ডিব্রুগর যাওয়ার লাইন এবং যোরহাট যাওয়ার লাইন এইখান থেকেই দুই ভাগে ভাগ হয়ে আলাদা হয়েছে। ডানদিকে ডিব্রুগর যাওয়ার লাইন আর বামদিকে যোরহাট যাওয়ার। মরিয়ানী স্টেশনে লক্ষ্য করলাম অনেক মহিলা রেলকর্মী তাদের নিত্য কাজে ব্যস্ত। তাঁরা আমাদের ট্রেনের জলের ট্যাঙ্কে জল ভরে দিচ্ছেন।

৭ ঘন্টার দীর্ঘ যাত্রাপথের অন্তিম স্টেশন যোরহাট, মরিয়ানী থেকে মাত্র ১৮ কিমি দূরত্বে অবস্থিত অসমের এই শহর, এইবার ট্রেন এগিয়ে চললো চা বাগানের মাঝখান দিয়ে। চা বাগানটির নাম "টোকলাই টি এস্টেট"। চা বাগান পার করার পর ট্রেন এগিয়ে চললো বেশ জনবসতিপূর্ণ এলাকা দিয়ে, অসম স্টাইলে তৈরী ছোটো ছোটো কটেজ, খুবই সাজানো গোছানো প্রতিটি বাড়ি। অবশেষে ট্রেন পৌঁছালো তার শেষ স্টেশন যোরহাট টাউন স্টেশনে। দুইটি প্ল্যাটফর্ম বিশিষ্ট ছোট্ট কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্টেশন এই যোরহাট টাউন। ট্রেন এখানে পৌঁছালো ঠিক দুপুর ১ টা বেজে ১০ মিনিটে, তার নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগেই। আবার দুপুর ২ টো বেজে ৩০ মিনিটে এই ট্রেনটি রওনা দেবে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে।

খুবই সুন্দর এক ট্রেন যাত্রার সাক্ষী থাকলাম আমি, যাত্রাপথের প্রতিটি মুহূর্ত বন্দী হয়ে আছে আমার মনের গিগাবাইটে। আমার মনের ক্যানভাসে এই রেল যাত্রা স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন।
শুনেছি ভারতীয় রেলওয়ে কর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আগামী দিনে ডিজেল ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনই চালাবেন। কিন্তু যদি সত্যিই এটা হয়, তাতে হয়তো অর্থনৈতিক দিকে ভারতীয় রেল উপকৃত হবে ঠিকই কিন্তু প্রকৃতি ও রেল-প্রেমীরা বঞ্চিত হবেন সৌন্দর্য্য থেকে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল এবং ডিজেল ইঞ্জিন যেন একে অপরের পরিপূরক, চড়াই উৎরাই পথে ডিজেল ইঞ্জিনের সেই ছন্দ তোলা আওয়াজ, তার সেই গুরুগম্ভীর ডাক, মাঝে মাঝে ধোঁয়া ছেড়ে জানান দেওয়া আমি পরিশ্রমী, তাইতো এই পাহাড়ী দুর্গম পথকেও আমি ডরাই না, আমি সক্ষম তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দিতে।
তাই উত্তর পূর্ব সীমান্তে এই রেলপথ থাকবে, থাকবে এই রেলযাত্রা, এই সুন্দর প্রকৃতি, কিন্তু আগামী দিনে হয়তো থাকবে না এই ডিজেল ইঞ্জিন।
আগামী দিনে কোনো একদিন সেই ডিজেল ইঞ্জিন আমাদের উদ্দ্যেশ্যে বলবে তোমরা আমায় ভুলে গেলেও, আমি তোমাদের ভুলিনি, আমি আজও প্রস্তুত ওই দুর্গম পাহাড়ী রাস্তায় পাড়ি দিতে।
লেখক বলেছেন "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ ক্রোড়ে", ঠিক সেইরকম ভাবেই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলে ডিজেল ইঞ্জিনের শোভা এক অদ্ভুত এবং অকল্পনীয়, যা চলে গেলে শ্রী হারাবে এই রেলপথ। যতই আসুক নিত্য নতুন প্রযুক্তি, যতই আসুক ওই পি-৫, পি-৭ কিন্তু অ্যালকো, ই.এম.ডি এর অবদান ভোলা অসম্ভব, ভোলা অসম্ভব তাদের ওই পাগল করা গর্জন, তাদের ওই দাপটের সাথে গোটা ভারতীয় রেলের ওপর শাসন। ডিজেল ইঞ্জিন চির জীবন তুমি বেঁচে থাকবে প্রতিটি রেল প্রেমীর হৃদয়ে।

এই যাত্রাপথের কয়েকটি ফটো তুলে দিলাম আপনাদের হাতে |

সূচীপত্র

KRC
D-1
SCHEDULED TIME TABLE OF JAN SHATABDI EXPRESS
(ALL DAYS EXCEPT SUNDAY)
Train No. 12067

KRC

KRC
DIMAPUR
डिमापुर

জনশতাব্দী এক্সপ্রেছ
JANSHATABDI EXPRESS
12067 UP
12068 DN
KRC

KrC

KRC
লামডিং জংছন
लामडिग जं • LUMDING Jn

KRC

KrC

ঘটনাক্রম

বিপ্লব দেবনাথ

ঘটনাক্রম ১

হাতের ঘড়িটা টিকটিক করে জানিয়ে দিলো সময় এখন কাঁটায় কাঁটায় দুপুর 12টা। ভ্যাপসা গরমের দুপুর,LC গেটে একাকী বসে আছি,সঙ্গী আর.এস.মেকলের (ভাষান্তর- পরিতোষ মজুমদার) 'উগান্ডার বনে জঙ্গলে' বইটি। পড়তে পড়তেই সশব্দে টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং আওয়াজে সম্বিৎ ভেঙে চুরমার।রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে এলো স্টেশন মাস্টারের গলা,"ডাউনে গাড়ি,সিগনাল দিয়ে দেবেন"।সময়ানুযায়ী বুঝলাম,গোবরডাঙ্গা-শিয়ালদহ লোকালের খবর হলো।

রোড ট্র্যাফিক ক্লিয়ার করে গেট ফেলে লক করে ডাউনের স্লট টানতেই প্যানেলে হলুদ আলো জ্বলজ্বল করে উঠলো, বুঝলাম হোম সিগনাল এবং পরের LC এর সিগনাল তখনও লাল।অগত্যা রোড সিগনাল লাল করে ফ্ল্যাগ নিয়ে বাইরে এসে সতর্কভাবে ট্রেনের গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।ইতিমধ্যে প্যানেলে তখন হলুদের পরিবর্তে সবুজ আলো জ্বলজ্বল করছে, অর্থাৎ হোম-গার্ড রিপিটার-স্টার্টার সবই ক্লিয়ার। ডাউন ট্রেন তখন ঝড়ের গতিতে আমার আগের গেটে ঢুকবে ঢুকবে করছে।

কিন্তু এ কি! চোখ আটকে গেলো।আগুয়ান ট্রেনের গতিপথে দুজন মহিলা (ছবিতে উপলব্ধ)। 'মহামানবীরা' পেছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে বেশ রিল্যাক্সে যেন সাংসারিক গল্পের আসর বসিয়ে দিয়েছেন। ভাবখানা তাঁদের এমন, যেন তেনারা ঠিক পথে চলছেন,ট্রেন ভুল করে ওনাদের পথে এসে গেছে।ট্রেনমহাশয় এখন ওনাদের সন্মান জানিয়ে লাইনের পাশের পিচের রাস্তা দিয়ে স্টেশনে পৌঁছবেন।ওনাদের হয়তো স্মরণে নেই, পায়ের নিচের পথটি মোরামের-পিচের পথ নয়, ওটা সাক্ষাৎ মরনপথ।

প্রথমে ভেবেছিলাম, লাইনের পাশের বস্তির লোক হয়তো। ট্রেন কাছাকাছি এলেই তাঁরা সরে যাবেন! কিন্তু না, আমি ভুল প্রমাণিত হলাম। দুর্ভাগ্য, তাঁরা যেন আজ ঠিক করেই নিয়েছেন,যে আর কিছুক্ষণ পরেই বনগাঁ হাসপাতালের পোষ্ট মর্টেম হাউসে থাকবেন।

গেট ছেড়ে যাওয়ার নিয়ম নেই,অগত্যা প্রাণপণ চিৎকার করে সতর্ক করলাম, কিন্তু ভবি ভুলবার নয়।ট্রেন তখন ২ পোষ্ট দূরে,দেবদূতের মতো উদয় হলেন এক পথচারী,

তিনি চিৎকার করতে করতে লাইন ধরে দৌড়তে থাকলেন 'মহিয়সীদের' উদ্দেশ্যে! তাঁদের সাতজন্মের ভাগ্য,কাজ হলো অবশেষে।তাঁর চিৎকারে কোনোমতে সম্বিৎ পেয়ে প্রায় লাফিয়ে তারা তখন আপ লাইনে। ঠিক বারো সেকেন্ড পরেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো গোবরডাঙ্গা শিয়ালদহ লোকাল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।নাহলে হয়তো আবার একটি বীভৎস ঘটনার সাক্ষী হতাম।কিন্তু যাঁদের কথা বলছি, এতো কিছুর পরেও তাঁদের কোনো হেলদোল নেই। আপ লাইন ধরে গেটের রাস্তায় এসে আমাদের দিকে সহজভাবে একবার তাকিয়ে তিনি চললেন তাঁর গন্তব্যপথে,যেন আমাদের কৃতার্থ করে।

ঘটনাক্রম ২

গেটের ঠিক উল্টোদিকেই ইংরেজি মাধ্যমের একটি নামী স্কুল।স্থানীয়রা ছাড়াও বহু দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়তে আসে।সকালে স্কুল খোলার সময়ে কিংবা স্কুল বন্ধ হওয়ার সময়ে গেট পড়লেই দেখা যাবে তাঁদের মারণ প্রতিযোগিতা।
কোনো মা কিংবা অভিভাবক তার বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছেন, গেট পড়া রয়েছে কিন্তু তাঁদের ট্রেন আসার জন্য অপেক্ষার কোনো প্রশ্নই আসে না। তাঁরা গেটের তলা দিয়ে রিল্যাক্সে আগুয়ান ট্রেনের গতিপথ অতিক্রম করবেন। আর ট্রেন একটু কাছাকাছি চলে আসলেও কোনো ব্যাপার নয়।তারা তখন একটু জোরে দৌড়ে লাইন ক্রস করবেন। আগুয়ান ট্রেনকে এভাবে পরাজিত করার আনন্দের যে অভিব্যক্তি তাঁদের মুখেচোখে আমি দেখেছি, তা যেন ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী সদস্যদের মধ্যেও দেখিনি।
ছোটবেলায় আমার দাদু বলতেন "শিক্ষিত পাঁঠা"। এর মানে তখন বুঝিনি, এখন বুঝতে পারি এর যথার্থতা। সবচাইতে বড়ো কথা, ওইটুকু বাচ্চা কি শিখলো? সে যখন একটু বড়ো হয়ে একা একা এভাবে লাইন পারাপার করবে,সে যে দুর্ঘটনা ঘটাবে না, তার নিশ্চয়তাই বা কে দেবে!স্কুলে হয়তো তাকে সচেতনতার পাঠ শেখাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে কি ঘটছে, সেটা তো আমার-আপনার সবারই বোধগম্য।

ঘটনাক্রম ৩

সময় 15.47।গুমা স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি,অপেক্ষা বারাসাত-হাবরা লোকালের।প্রথম শেডের নীচে দাঁড়িয়ে ঘুগনি খাচ্ছি,হঠাৎ আপ লাইনে অশোকনগরের দিকে তাকিয়েই বুকটা ধক করে উঠলো।লাইনে এতো ভিড় কেন! তাহলে কি কেউ কাটা পড়লো?(ট্রেন দুর্ঘটনা দেখতে দেখতে স্বভাবতই এটা মাথায় আসে)। উৎসুক মন, ভাবলাম ট্রেন মিস হয় হোক,ব্যাপারটি দেখে আসি। কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম,তা রীতিমতো ভয়ঙ্কর। আপ লাইনের উল্টোদিকে একটি মাঠ, সেখানে ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে। তাঁদের কাছে সেই টুর্নামেন্ট দেখার সবচেয়ে ভিউ আপ লাইনের রেলওয়ে ট্র্যাক। পারলে কেউ বাড়ি থেকে চেয়ার নিয়ে ট্র্যাকের ওপর বসে খেলা দেখে! ট্রেন এলে তারা একটু সরে দাঁড়িয়ে, কেউ আবার শুধু পশ্চাৎদেশ এগিয়ে-পিছিয়ে রেলগাড়িকে

ধন্য করেন।আর এরকম টুর্নামেন্ট-মেলা প্রতিবছরই হয় তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে বৃহস্পতিবার এবং রবিবার তো অবস্থা আরো ভয়াবহ হয়।ওই দুদিন গুমার হাট বসে।রেলওয়ে ট্র্যাকই যেন তখন হয়ে যায় রাস্তা আর রেলগাড়ি তখন চলে পাশের পিচের রাস্তা দিয়ে।

চকিতে মনে পড়ে যায়, অমৃতসর ট্র্যাজেডির কথা।ভগবান না করুন,সেই ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি না হয়।তারপর তো অবরোধ, প্যানেল ভাঙচুর এসব তো পরম্পরা।

ঘটনাক্রম ৪

আপ বারাসাত বনগাঁ লোকালের খবর হয়েছে।লাইন ক্লিয়ার,সবুজ সিগনাল জ্বলজ্বল করছে।সিগনাল-টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের দুজন কর্মী গেট এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।দূরে আপ লাইন দিয়ে দুজন মহিলা ট্রেনকে সামনে রেখে (ভাবেই ট্র্যাকে চলার নিয়ম) গুমা স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন। একজনের কানে ফোন এবং দুজনেই ছাতা মাথায়। যথারীতি ভাবলাম, ট্র্যাকে যখন নিয়ম মেনেই হাঁটছেন,সময়মতো সরে যাবেন।তাও একবার সতর্ক করে দিলাম।প্যানেলে দেখলাম আগের গেটের সিগনাল লাল হয়ে গেলো,মানে আমার গেটে গাড়ি ঢুকছে। ট্রেন তখন আমার গেটের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে,কিন্তু মহিলাদুটির যেন কোনো হেলদোল নেই। হঠাৎ শুনি সিগনাল স্টাফদের তীব্র চিৎকার, ট্রেন তখন মাত্র এক পোষ্ট দূরে। এতো সামনে ট্রেন দেখে মহিলাদুজন সাময়িকভাবে প্রায় চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। লাইনের দুপাশে না সরে তাঁরা হতভম্ব হয়ে ট্র্যাকেই দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবলাম হয়তো সব শেষ, শেষপর্যন্ত এখানে দেবদূতের ন্যায় দেখা দিলেন S&T এর ওই দুজন কর্মী। তাঁদেরই চিৎকারে মহিলাদ্বয় কোনোমতে লাইনের পাশের লাফিয়ে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছিলেন । সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলে যা হয় আর কি,ঘোর যেন তাঁদের কাটছিলো না। গেটের পাখার তলায় বসে,চোখে মুখে জল দিয়ে, জল খেয়ে অবশেষে ধাতস্থ হলেন। কথাপ্রসঙ্গে জানলাম তাঁদের বাড়ি বারাসাত,গুমা স্টেশন থেকে বারাসাত যাওয়ার ট্রেন ধরবেন। কিন্তু মানুষ নিজে থেকে সচেতন না হলে আপনি শত চেষ্টা করেও তাকে সচেতন করতে পারবেন না। এক্ষেত্রেও তাই, বিনা দ্বিধাভরে ওই মারণ ট্র্যাক ধরেই

গুমার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। এরা ভাবেন না ,যে চিরদিনের জন্য যায়, সে তো গেলোই কিন্তু সেই মানুষটির জন্য যারা অপেক্ষা করে থাকে, তাঁদের অবস্থা কেমন হয়।

উপরোক্ত ঘটনাগুলো কোনোরকম বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে।এরকম প্রচুর ঘটনার সাক্ষী হচ্ছি প্রতিনিয়ত। মাঝেমাঝেই ডোমকে বাঁশ নিয়ে বাফারের ওপর দেখলে বুকটা ধক করে ওঠে...জানি না কার আজ কোল খালি হলো

আজ লেভেল ক্রসিং গেটে RPF মোতায়েন রইলো, দেখা যাবে, কেউ ট্রেনের সামনে লাইন পারাপার করবেনা। কিন্তু পাহারা না থাকলে দুদিন পরেই আবার সেই প্রতিযোগিতা।একটু সময় বাঁচানোর তাগিদে,নিজেদের অদূরদর্শীতায় এই অসম লড়াইয়ে কখনো 'জিতছি' আমরা, আবার কখনো যন্ত্রদানব। কখনো ট্রেনের সামনে দৌড়ে লাইন পার হয়ে আমি 'জয়ী', আবার কখনো ছিন্নবিচ্ছিন্ন রূপে নিজেকে আবিষ্কার করি 1676 সেন্টিমিটারের মাঝে।তখন প্রিয় মানুষরাও আমার সেই বীভৎস রূপ দেখে চোখ বুজে ফেলে, ভাষা হারিয়ে ফেলে।আর ট্রেনে দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যু অনেক বেশি সুখকর।খুব কম মানুষই দেখেছি আহত হয়েও স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করছেন।
তবুও আমাদের কাছে 'সচেতনতা' শব্দটি ব্রাত্য,ওটার উপযুক্ত স্থান যেন ডিকশনারিতেই।জানি না, সেটা কখনো বাস্তবায়িত হবে কি না ! যাই হোক,ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

সূচীপত্র

রেলফ্যান

বিপ্লব দেবনাথ

ডিউটি শেষ করে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ঢুকছিলাম।শ্যেনদৃষ্টির মতো তখন লক্ষ্য একটাই যে,কখন ফ্রি হবো! কারণ প্রতিদিনের মতো আজকেরও তোলা ট্রেন বিভিন্ন ছবিগুলো ফেসবুককেন্দ্রিক বিভিন্ন রেলওয়ে গ্রুপ এ আপলোড করতে হবে।না হলে আমার পেটের ভাত পুরোটাই অপাচ্য থেকে যাবে,সেটা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি এটা আমার একটি নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যেই পড়ে।আর এই কাজের ক্ষেত্রে 'ছুটির দিন' বলে কোনো শব্দ আমার অভিধানে নেই।

পথিমধ্যে স্থানীয় এক পাড়াতুতো কাকার ডাকে একটু বিরক্ত হয়েই(বিরক্ত এই জন্যেই উৎপাদিত হয়েছিল যে, ট্রেন এর ফটো আপলোড করতে দেরি হয়ে যাবে)দাঁড়ালাম, মানে অনিচ্ছাসহকারে দাঁড়াতে হলো আর কি! ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার বাবার বন্ধু হলেও আমার সাথে সেভাবে কোনোদিনই কথা হয়নি।ওই 'কেমন আছেন' শব্দবন্ধেই তিনি আর আমি সীমাবদ্ধ ছিলাম।ধাতস্থ হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তাঁর প্রশ্নবানে আমি প্রায় জর্জরিত।কোথায় পোস্টিং,বর্তমান বেতন কত থেকে শুরু করে মায় কবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি (আমার মতে হাঁড়িকাঠে গলা)এসব জিজ্ঞাস্য সহ সাম্প্রতিক পে কমিশন এর বেতনবৃদ্ধি নিয়ে একবারে যেন আহ্লাদিত হয়ে গলে গেলেন। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ভদ্রলোকের একজন বিবাহযোগ্যা কন্যা রয়েছে)।অতঃপর, কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "তোমার শখ কি?" প্রত্যুত্তরে বললাম, রেলকে ভালোবেসে মনে-প্রাণে-অন্তরাত্মায় নিজেকে বিলীন করে দেওয়া।

সাধারণ চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে তিনি বললেন, "হেঁ-হেঁ, সে তো বটেই, রেলওয়েতে যখন আছো তখন তো সেটাই সম্ভব।" এ আর আশ্চর্য কি!

রাগত হয়ে বেশ উদাত্তস্বরেই বললাম,আমি রেলওয়ের ট্র্যাক, ইঞ্জিন, সিগনাল,হর্ন এসবের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাই, মিশে যেতে চাই এদের সাথে।আমি আর রেল পরস্পরের পরিপূরক হয়ে থাকতে চাই।রেলওয়েই আমার স্বর্গ,আমার প্রেম, আমার অর্ধাঙ্গিনী,আমার সমস্ত সত্তা।

ভদ্রলোকের মুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝলাম তিনি আমার মধ্যে কিছু সাধারণ মানুষ

বিবেচ্য 'অস্বাভাবিকতা' খুঁজে পেয়েছেন,যদিও তা আর অস্বাভাবিক কি।এগুলোর তো আমরা পদে পদেই মুখোমুখি হই।তারপর যখন গম্ভীরস্বরে আমার মুখে উচ্চারিত হলো,"ইঞ্জিন আমার প্রেমিকা,তাঁর সাথেই আমি অতিবাহিত করতে চাই আমার সারা জীবন।" তখন আমার আপাদমস্তক আরও একবার ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন আর মনে মনে হয়তো স্বগতোক্তি করলেন যে, আর কিছুদিনের মধ্যে রাঁচিই আমার একমাত্র উপযুক্ত জায়গা। অবশেষে 'আমি আসি' এই ছোট্ট শব্দটুকু উচ্চারণ করে হনহন করে বাড়ির দিকে হাঁটা লাগালেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম আজ হোক কাল হোক আমার বাবার কাছে ঠিক এসে বলবেন "ছেলেটার বিয়ে থা দাও, নাহলে মাথায় বিকার দেখা যাবে।"

যাই হোক, রেলওয়ের প্রতি ভালোবাসার নেশা যার মধ্যে একবার ঢুকে গেছে, সেইই একমাত্র অনুভব করতে পারবে, এই নেশার কাছে অন্য যে কোনো মাদকের নেশা অতীব তুচ্ছ। মনে পড়ে,ছোটবেলায় মাঝে মাঝে দুপুরবেলা বাবা-মা যখন ভাতঘুম দিত, আমিও সেই ফাঁকে উঠে চলে যেতাম ছেলেবেলার দুস্টুমি করতে।কিন্তু সেটা অবশ্যই রেললাইন কেন্দ্রিক। সমবয়সী সব ছেলেরা যখন মাঠে দাপিয়ে খেলত কিংবা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের নীল আকাশে উড়ন্ত প্রজাপতির ন্যায় ভাবতো, তখন আমি চলে যেতাম কোনো রেলট্র্যাক এর পাশে, সেখানে কোনো লেভেল ক্রসিং এর রেলিংএ বসে দেখতাম 'রাজা' এর আসা যাওয়া। ডিউটিরত্বগেটম্যান কিভাবে খবর পায় যে ট্রেন আসবে,কিভাবে সিগনাল হবে সেই সময়েই ছিল এগুলো আমার কৌতূহলের বিষয়। আর একটা কথা অনেকেরই মনে একটা প্রার্থনা থাকে যেটা সামনে প্রকাশ করলে লোকে তো বিরক্তবোধ করবেই, তার সাথে সাথে বক্তার মাথায় কিঞ্চিৎ “ছিটগ্রস্ত” আছে বলে মনে মনে ঠাউরে নেবে। আসলে ব্যাপারটা কি রেলপাগলরা সাধারণত ট্রেনেই ভ্রমন করি। কিন্তু কদাচিৎ যেখানে গন্তব্যস্থল সেখানে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে ট্রেন পাওয়া না গেলে সেখানে বাস কিংবা রোড ভেহিকেল ছাড়া গতি নেই। বিষণ্ণ মন নিয়ে তো উঠলাম বাসে, ওঠার পরই মনে মনে আকুল প্রাথর্না, যদি একটা রেলগেট এর দেখা পাই। রেলগেট গোচরে আসলেই মনে মনে তখন একটাই প্রাথর্না রেলগেট যেন বন্ধ থাকে। আনন্দের মাত্রা শতগুন হয় যখন রোড সিগনাল লাল,তার মানে ট্রেনের সিগনাল সবুজ মানে ধুলো উড়িয়ে ট্র্যাক কাঁপিয়ে তিনি আসছেন।

বাসওয়ালাদের মুখ বিরক্তিতে তখন ঠিক বাংলার পাঁচ। কিন্তু কিছু করার নেই রাজার পথেই রাজা এগোবেন।মুগ্ধতার মাত্রা তখন আরো বেড়ে যায় যখন দেখি কোনো এক বাবা-মা তার সন্তান কে বলেছে "বাবু দেখো দেখো ওই যে ট্রেন যাচ্ছে"।এই আনন্দ যে কি সেটা একমাত্র রেলপাগলরাই বুঝবে। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না ঠিক, এই অংশটুকু লেখার সময় চোখ ছলছল করছিল এক বিজাতীয় আনন্দে যেটাকে বলা হয় আনন্দাশ্রু।

ঝাপসা চোখেই দেখি, দু পাশে কত রথী-মহারথীর বাহন অপেক্ষায় কখন রাজা আসবেন। অবশেষে নিজের গর্জনে ১.....২.....৩..... গতিবেগে বেরিয়ে গেলেন রাজামশাই।

আমার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি খুবই সত্যি।আমাদের সবার এমন কিছু বন্ধু থাকে যারা আমাদের মোবাইল ফোন একটু কোথাও রাখলেই ঘাঁটাঘাঁটি করে।কিন্তু আমার বন্ধুরা তো আমার মোবাইলে ঘাঁটলে আনন্দ তো দূর বরং বিরক্তিবোধে মুখ আচ্ছন্ন হয়ে যায় কারণ মোবাইল জুড়েই শুধু রেল এর ছবি,রেল সম্পর্কিত অ্যাপ আর ফেসবুক সহ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে শুধু রেলের ছবি, ভিডিও প্লেয়ার এ রেল এর ভিডিও.....তাই আমার মোবাইল সুন্দর ফিচারের(Asus Max Pro M2)স্মার্টফোন হলেও তাদের কাছে এটা নিতান্তই একটা "কিপ্যাড ফোনে"র সমতুল্য।

আমার আর এক স্বভাব, রেলফ্যান ছাড়া অন্য কোনো বন্ধুরা কোন গন্তব্যস্থল বাই ট্রেনে গেলেই প্রথমেই আমার প্রশ্ন, "কোন ইঞ্জিন দিয়েছিলো". আমার এটা খেয়ালই নেই, যে তারা কি করে এটা জানবে। কিছু উত্তর পাই যে, 'লাল ইঞ্জিন না সাদা ইঞ্জিন' বা কিছু উত্তর পাই ,জানি না।' সবচেয়ে বেশি পাই এই উত্তর যেটা হলো, "আমি ঘুরতে গেছি, আমি কি ইঞ্জিন দেখতে গেছি নাকি।"

আরো বেশি অবাক হই যখন দেখি, রেলপাগলদের অন্য কোনো কাজে সময় না থাকলেও ট্রেন দেখার সময় ঠিক আছে। নতুন কি ট্রেন উদ্বোধন হবে, কোন ট্রেন কি কোচ পাবে, কোন ইঞ্জিন আজ কার সাথে ক সবই তাদের নখদর্পনে। নিজেদের বড়াই করছি না, তবে আমি হলফ করে বলতে পারি, আমাদের মধ্যে কিছু রেলপাগল যা জানে অনেকে আচ্ছা আচ্ছা রেলকর্মীরাও তাদের জানার ধারেকাছে দিয়ে যাবে না। কখনো কখনো আমাদের সাধারণ মানুষ, রেল কর্মচারী কিংবা নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে হেনস্থা হতে হয় কিন্তু তাতে যদি আমাদের একটুও দমানো যায়।

ব্যতিক্রম ও আছে।অনেক রেলকর্মীরা ব্যাপারটিকে বুঝতে চেষ্টা করেন,উৎসাহ দেন।অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সেইসব রেল কর্মচারীদের যারা রেলপাগলদের অনুভূতি গুলো বোঝে।

অনেকেরই হয়তো এরকম বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আছে। ইচ্ছা হলে তারা তাদের অভিজ্ঞতার আনন্দ আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারে। জানি আমার এই লেখা পড়ে অনেকে আমার এখনই রাঁচি যাওয়া উচিত কি না, তা নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক বসাবে। আমার তাতেও বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, কারণ রাঁচি গেলেও সেই হাওড়া-রাঁচি শতাব্দী কিংবা অন্য ট্রেন এবং বিভিন্ন রকমের ইঞ্জিন। সুতরাং আমি সানন্দে রাঁচি যেতে রাজি ।

রেলফ্যানিং ছিল, আছে এবং থাকবে ।
রেলওয়ে এর প্রতি ভালোবাসা আমাদের বাড়বে বই কমবে না।
রেলফ্যানিং যুগ যুগ জিও।
ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকুন,জমিয়ে বাঁচুন।

সূচীপত্র

ফেলে আসা শৈশব

সৈকত সাধু গোপীনাথ পাল চন্দন মাইতি

ভোর বেলা খুব তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে যেত। বিছানা ছেড়ে বাসিমুখে ছুট্টে দৌড় আমাদের আড্ডাস্থলে। ইতিমধ্যে দু একজন বন্ধু অপেক্ষারত। শুরু হতো বাড়ি বাড়ি ফুল তোলা। শিউলি, টগর, জবা,করবী, সন্ধ্যা মালতী, নয়নতারা, যেটা যখন পাওয়া যায়। সূর্যমুখী আর গোলাপ পাওয়াটা ছিল খুব দুরূহ।ধরা পড়ার ভয়।"কুকুর হইতে সাবধান"। তখন এটাই ছিল আমাদের নেশা।তারপর বাড়ি ফিরে দাঁত মেজে ব্রেকফাস্ট।চা দিয়ে বাসি রুটিই তখন ছিল অমৃত সমান।

কখনও কখনও চিনি ভরা রুটি হলে বেশ হয়।এরপর বসত পড়ার আসর।কে কতো চেঁচিয়ে পড়তে পারে-চলতো প্রতিযোগিতা।পড়ার ফাঁকে আনমনা মন উড়ে বেড়াতো কল্পনার জগতে -"আগেরদিন ওই রকম একটা লুজ বলে কেন ছয় টা মারতে গেলাম বা ঝুঁকি নিয়ে রানটা না নিলেই হতো"।

হঠাৎ মা-এর চিৎকার---"স্নান টা করতে যা বাবু, স্কুলের সময় হয়ে গেছে"। বাস্তবে ফিরে এসে, সোজা দৌড় পুকুরে, তারপর স্কুলে। এলুমিনিয়ামের স্কুলের বাস্কটা আজও রেখেছি স্বযত্নে। তাতে শুধু জায়গা করে নিয়েছে অন্য জিনিস।স্কুল ফিরে খেলার মাঠে চুটিয়ে খেলা আর ধুলো মেখে ঘরে ফেরা। ক্লান্ত শরীরে ঘুম ভালো হয়।

এসব আজ আর নেই।জীবনের যাঁতাকলে পিষতে পিষতে হারিয়ে গেছি আমরা, হারিয়ে গেছে আমাদের শৈশব।

তখন, বার্থডে ছিলনা, হতো জন্মদিন। মা, পায়েস বানাতো আর দুপুরে মাংস হতো। একটা পেন বা প্যাস্টেল যক্ষের ধনের মতো সামলে রাখতাম কয়েক মাস। সারা দুপুর দিদি, ভাইদের সাথে উদোম মাচিয়ে, একসাথে মাটিতে বসে খেয়ে , সন্ধে হতে না হতেই ঘুম। ওই দিন সব পড়া মাফ ছিল।

এখন, গোটা ঘরে রংবেরঙীন বেলুন, কেক, আলেক্সা তে হ্যাপি বার্থডে, ক্যাডবেরির সমাহার। তাও ওদের চোখে ঘুম নেই, কি যেনো একটা খুজেঁ যাচ্ছে সবসময়, একটা থেকে আর একটা। থিতু নেই। ভালো লাগাটা কি ক্ষণস্থায়ী হয়ে যাচ্ছে ইদানিং?

তখন ছিলনা কোনো mall বা multiplex, কিন্তু ছিলো বাপী মা এর সঙ্গে সিনেমা দেখা সিনেমা হলে গিয়ে। তখন ছিলো প্রতি বুধবার চিত্রহার আর কবে যেন হতো চিত্র মালা । তারপর হটাত একদিন এলো cable টিভি এর রমরমা, শুরু হলো আর কতো কী। এখনো মনে পরে তখন পরি class VIII এ, একদিন DD 1 এ Top 10 গানের অনুষ্ঠানে দিলো Masoom সিনেমা এর গান। মা বাপী এর কাছে আবদার করলাম এই সিনেমাটা দেখব। যেই গ্রীন সিগনাল পেলাম, পরের দিন স্কুলে additional physics ক্লাসে স্যার কে বলে সোজা তাড়াতাড়ি বাড়ি, আর মা বাপী এর সঙ্গে মনোজ hall এ Masoom দেখা।
খুবি অদ্ভুত মনে হয় সেই সব দিনের কথা। আজকের দিনে আমরাই ঠিক করি কোন মুভি (এখন আর সিনেমা বলি না আমরা) ছেলে মেয়েদের দেখাব আর কোনটা না। আমরা নিজেরাই বন্ধুত্ব করতাম আবার ভাঙতাম। আর এখন আমরাই ঠিক করে দি আমাদের ছেলেমেয়েরা কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে আর কার সঙ্গে নয় । আমরা ওদের করে তুলছি যন্ত্র মানব । আমাদের কাছে তবু আছে আমাদের শৈশবের স্মৃতি । কিন্তু ওদের কাছে থাকবেনা কিছুই। থাকবেই বা কী করে, আমর বাপী এক জায়গাতেই চাকরি করেছিলেন আর আমি সে সুবাদে সেখানেই ছোট থেকে বড়ো হয়েছি, কিন্তু আমার তো সে ক্ষমতা নেই, উচ্চাকাঙ্খার জন্যে কখন কোথায় আছি, আবার কোথায় যাবো জানি না। তো আমাদের ছানাপোনাদের কি করে গড়ে উঠবে শৈশবের ইতি কথা। আমার বন্ধুদের বাবারাও ছিলো আমার বাপির ছোট বেলার বন্ধু, কিন্তু ওদের এরকম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম । হায়রে আমরা তোদের কী মানুষের মতো মানুষ করতে পারছি?

সূচীপত্র

সেরকম কিছু নয়

কৃষ্ণেন্দু দাস

১৭ ই সেপ্টেম্বর ... ভোর ৪টে। ছুটলো হসপিটালে। ব্যথা শুরু হয়েছে। এত সকালে আর কে বা থাকে জেগে। এমের্জেন্সীতে গিয়ে এডমিট করানো আর তারপর সিস্টারদের দেখা শুরু। যদিওবা ডক্টরকে ফোনে পাওয়া গেলো, কিন্তু সশরীরে হাজির হলেন দশটার সময়। আর ঠিক ১২টা ৫ মিনিটে জন্ম হলো এক ফুটফুটে বাচ্চার।

বড়ো হতে লাগলো বাচ্চাটা। জীবনও চলতে লাগলো নিজের মতো। যত বড় হয় মা আর বাবার আগ্রহ বাড়তে থাকে, কি কি বলবে কবে বলবে এই সব। কিন্তু কেন যেন কথা বলতে চায় না। কিছু দেখলে হাত নাড়ে খুশিতে। কোনো জিনিস ঠিক জায়গায় না থাকলে চিৎকার করে। এটা কি স্বাভাবিক? অনেককে জিগেস করে। কেউ বলে "আরে চিন্তা করিস না। বাচ্চারা সব আলাদা- ওরকম হয়"। আবার কেউ বলে ডক্টর দেখা। মা বাবার মন। কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তাহলে কি কোনো সমস্যা? মনকে বোঝাতো না,না - সব ঠিক আছে। কিন্তু যদি ঠিক না থাকে? আর কোন বাচ্চা এরকম ? রাস্তা ঘটে, মলে, ট্রেন বা বসে চোখ ঘুরিয়ে খুঁজতে থাকে। আর কে এরকম? কেউ আছে ?

অবশেষে একদিন থাকতে না পেরে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। "না সেরকম কিছু নয়" শোনার জন্যে। কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না। "এটা অটিজম"... ডাক্তার বলে চললেন। সিরিয়াস নাও হতে পার। টেস্ট করতে হবে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল মনে হলো মা বাবার। যদিও বাবা বাইরে দেখালো সব ঠিক আছে আর সব ঠিক করে দেওয়া যাবে। কিন্তু ভেঙে পড়ল ভেতর থেকে। কি করবে। কি এই অটিজম? প্রতিদিন বাচ্চাটাকে দেখতো আর চোখে জল ভেসে উঠতো। কই আগে তো এই চোখ দিয়ে দেখি নি। এত অসহায় লাগছে কেন ওকে?

শুরু হলো আরেক জীবন যুদ্ধ। অটিজম নিয়ে পড়াশোনা ,স্পীচ থেরাপি, বিহেভিওরাল থেরাপি এই সব। প্রতিদিন কিছু পরিবর্তন হচ্ছে? কখনো মনে হত হচ্ছে। আর যেদিন মনে হতো না, সেদিন আর ঘুম আসতো না। মাঝে মাঝে মনে হত কেন তাদের সাথে এইরকম, কেন একটা বাচ্চা সুস্থ সবল নয়। রাস্তায় তো কত বাচ্চা ঘুরে বেড়ায়, কত অবহেলায়। তারা তো দিব্বি আছে।

ধীরে ধীরে শুরু হলো পরিবর্তন। মা বাবাও সমান ভাবে লেগে থাকলো। প্রশ্ন করতে শিখলো, উত্তর দিকে শিখলো, নিজের চাহিদা জানাতে শিখলো। কত খুশি হতো ওরা দুজনে যখন বাচ্চা আলতো কথা বলতো, আলহাদ করতো। এবারে ও ৬ বছর হবে। এখন বকতে শিখেছে, ঝগড়া করতে শিখেছে, শাসন শিখেছে, মেয়েদের পাশে বসতে শিখেছে, আর লজ্জা গলায় তাদের নাম বলতেও শিখেছে। কিছু বাজে কথাও শিখেছে মনে ইডিয়ট, ননসেন্স এই জাতীয়। এখন দেখলে মনে হয় আমরা ভাগ্যবান ওকে পেয়ে। এখন আর মনে হয় না আমাদের সাথেই কেন। শুধু ভাগ্যবান হই ওর সাথে থাকতে পারে আর জীবন যুদ্ধে জিতে গিয়ে। আমাদের ছেলে তো।।।।

চুটকি হাসি - রাজেন্দ্র আচার্য

কিছুদিন আগে পুরুলিয়া সদর হসপিটালে গেছিলাম। এক মহিলা আরেকজনকে বলছে, আমার মরদ টর চিমনিটাই খারাপ হয়ে গেইলছে, দাগদার তাই বৈল্লেক। আমি কৌতুহল সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম - এ মাসী ডাগদার কি বইলেক আরো এক বার বল নঃ, আমি নাই বুঝলি ।

- আমার মরদ ট দমে মদ খাইত তাই ডগদার বইলো জে মদ খায়ে খাইয়ে উয়ার দুটা চিমনি খারাপ হইঞ্চে ।

পাশের থেকে একজন বলে উঠলেন - উটা চিমনি না কিডনি বলে রে বাপ !

সূচীপত্র

আমি

সৈকত সাধু

আমি কে? আমি একজন মানুষ, কিন্তু কি করে বলি আমি মানুষ। ছোট থেকে পড়েছি মানুষ মানেই অনুভূতি আছে, স্পন্দন আছে, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে, আছে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা। আরে সেই জন্যেই তো আমরা প্রাণীকূলে মহান ।।।

ঐ যে একবার মা না বাবা কেউ একজন বলেছিলেন ভগবানের সুন্দর আর অমোঘ সৃষ্টি মানুষ, আর ভাবেই তো স্কুল কলেজে আমরা আমাদের আধিপত্য দেখিয়েছি, প্রতি মুহূর্তে গর্জে উঠেছি। মা বাবা কে তাচ্ছিল্য করেছি কোনো কোনো সময়। সেই সময়টাই এমন একটা মারকাটারি মূর্তি ছিলো যে আমরা ভেবেছি মা বাবারা সবাই বোকা আর আমরা সবজান্তা। বাবা বলতেন "ওকে ওর মতন করে থাকতে দাও, যা করছে করতে দাও।" তাই আমিও বেপরোয়া ভাবে আমার যা ইচ্ছে তাই করে গেছি । বাবার দেখিয়ে দেওয়া রাস্তায় না হেঁটে নিজেই চলেছি বাইপাস ধরে। সাফল্য যে পাই নি বলবো না, একটা সময় মা বাবা দুজনেই আমার উন্নতি দেখে খুশী হয়েছেন।

কিন্তু আমি, আমি যেন হারিয়ে গেছি কোনো একটা জানা অজানা পৃথিবীতে । কখনো মনে হয় আমি নিজের ইচ্ছে মতন করে ভুল করেছি, কখনো মনে হয় আমি একটু বেশীই আঁতেল হয়ে মা বাবার কথা শুনিনি ।

যাকগে সেসব কথা এখন, সেতো মা বাবা বলেইছিলেন একটা সময় হয়তো আমি ভাববো আর ভেবেই যাবো । কিন্তু সেই দিনগুলো আর ফিরে পাবনা ।

এখানেই শুরু নিজেকে খুঁজে বের করার গল্প । আমি যদি নিজেকেই চিনতে না পারি, আমি যদি নিজেকেই বুঝতে না শিখি, আমি যদি নিজেকেই অনুপ্রাণিত করতে না পারি, আমি যদি নিজেকেই সন্তুষ্ট করতে না পারি, তো আমি কিসের আমি। আমার নিজের বেছে নেওয়া রাস্তাকে যদি পরে আবার বিশ্লেষণ করতে বসি, তা হলে বলতে হয় আমি নিজেকেই এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি।

তাই "আমি" কে বুঝতে শেখা খুবই দরকার ।

সূচীপত্র

আমার দেশ

বিপ্লব রায়

দশ বারো বছর আগের কথা। না, ঠিক গল্প নয়,চলার পথে ছোট্ট ঘটনা। সকাল বেলা বাস স্ট্যান্ডে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছি অফিস যাব বলে। বেশ কিছুটা লেট হয়েছে সেদিন। হটাৎ, দেখি এক বয়স্ক ভদ্রলোক স্কুটারে করে পেরিয়ে গেলেন আমার দিকে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে। মেজাজটা খানিক খারাপ হলেও,আবারও বাসের অপেক্ষায় মনোনিবেশ করলাম। নাহ্, বাস এলো না, কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ওই ভদ্রলোক ফিরে এলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি লেট হচ্ছে খুব? আমি লিফট দিতে পারি। আমি ওদিকেই যাব।" আমিও সাত পাঁচ না ভেবে সটান চেপে পড়লাম স্কুটারে।

কিছুটা যাওয়ার পর,ভদ্রলোক বললেন, "কেন জানিনা মনে হল,আমি যেদিকে যাচ্ছি, আপনিও সেদিকেই কোথাও যাচ্ছেন, আর আপনার বোধ হয় তাড়াও রয়েছে। " বেশ অবাক হলাম, কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

সাথে সাথে বসের রক্ত পিপাসু মুখটা মনে পড়ে গেল এক ঝলক।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ঠিক কোথায় যাবেন বলুন তো? নিজ গন্তব্য জানালাম।। উনি বললেন,"দেখুন, কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমি আপনার অফিসের কাছাকাছিই যাচ্ছি।"আরও বললেন,"বুঝলেন,সবই হচ্ছে predestined."

চমকে উঠলাম এক সাদামাটা পোশাক পরিহিত এবং ততোধিক সাদামাটা চেহারার মানুষের মুখ থেকে এ হেন শব্দবন্ধ শুনে।কিছু টা লজ্জিত হলাম, বহিরঙ্গ দিয়ে বিচার করার নিজের এই মানসিকতায়।

আলাপচারিতায় জানতে পারলাম, ভদ্রলোক মুসলিম। ওনাদের কোয়ার্টার এর পাশেই দূর্গাপূজো হয়। আর ভোগ রান্নার প্যান্ডেল ও অন্যান্য আয়োজনও হয় ওনাদেরই কোয়ার্টারের বাগানে। ফি বছর পূজোয় গিন্নীকে শাড়িও কিনে দেন। এই আলোর রোশনাই, ধূপ ধূনোর গন্ধ, উৎসব মুখর মানুষের ভিড়ের অংশ হওয়াটা ওনাদের নাকি ভারি ভালোলাগে।বয়স আর বোধশক্তি দুই বেশি হওয়ায় ভদ্রলোক বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে শুনে অবাক হয়েছি হয়তো বা বিশ্বাসই করিনি।মৃদু হেসে বলেছিলেন ধর্ম নাকি নারকেলের মতো।কিন্তু

আমরা নারকেলের শাঁস বা জল নিয়ে আগ্রহী নই। মানুষ লড়াই করে নারকেলের বাইরের খোল নিয়ে।

যাত্রা পথ নাতিদীর্ঘ তাই বেশী সময় লাগলো না।আমাকে নামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন তার কাজে আর আমি হাঁটা দিলাম আমার অফিসের দিকে। এত বছর পর,আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সাধারণ ওই মানুষটির কথা ভীষণ প্রাসঙ্গিক মনে হয়।মনে হয়,প্রাত্যহিক জীবনে জীবন জীবিকার জন্য লড়াই করতে থাকা এই সাধারণ মানুষগুলো ভীষণ "টলারেন্ট"।আর দেশে তো সাধারণ মানুষের সংখ্যাটাই বেশি, তাই না?

ইরেজার

সৌরভ ঘোষ

কোথায় যে গেল, ইরেজার টা! কিছুতেই খুঁজে পেলাম না।
একটু আগেও দেখলাম, টেবিলে ছিল। এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না।

হিসাবে মন বসছে না।
মাথাটা দপদপ করছে, বারেবারে হিসাব ভুল হচ্ছে।
মনটা বড় খালি খালি লাগছে।
নাতিটা বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, যেন সবাইকে দৌড় করাচ্ছে। ঠিক বাবুর মত হয়েছে।
আজ বাদে কাল পুজো, ওরা এবার নাকি শহরের পুজো দেখবে।
গ্রামের পুজোতে মন ভরছে না।
অবশ্য ওদের মন ভরার কথা নয়। ছোট থেকেই তো শহরের পুজো দেখে মানুষ।

আজকাল বাবার কথাগুলো বড় মনে পড়ে যায়। বুকটা চিনচিন করে ওঠে।
কাল তর্পণ করতে যাবো।
ইরেজারটা যদি পেতাম!!!

সূচীপত্র

সৈকত সাধু (চন্দ্রযান উপলক্ষে)

जो कुछ करना चाहते है,वही कुछ करते है ।।
जो कुछ करना चाहते है,वही गलतियाँ करते है ।।
गलतियाँ करते करते वही एकदिन शिखते है ।।
और जिस दिन शिख जाते है,
उसी दिन महान हो जाते हैं ।।
और उस दिन पूरी दुनिया
अपना शिश झुका देतें है ।।।।

ISRO हम सब आप के साथ है ।।।

\

সূচীপত্র

বিশ্বজিত প্রামাণিক

ना माई गलिब हं न गुलजार
ना किताबो के पनयो मे हुण
अपना साया हुन माई जीस
कांटे से बहत मिलन
हर काँटे की डार भई अलग होंग
पर ओ कांटे को भी सुकुन मिले
जो मुजे छुक आपनी दरद दाबा मांगे

সূচীপত্র

একটি রাত

সুরজিত দুবে

রাত এগারোটা দশ, হাওড়া ব্যান্ডেল লোকাল সবেমাত্র শ্রীরামপুর স্টেশনে এসেছে। লোকের সমাবেশ নেই বললেই চলে। রেশমি যখন মেয়েদের কামরা থেকে নামল তখন স্টেশন পুরো ফাঁকা। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি । এই বৃষ্টির কারণে আজ এত দেরী, না হলে অন্যদিন সাড়ে নটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে। বৃষ্টির জলে ভিজে মোবাইলটা বন্ধ, বেশ খরচের ধাক্কা মনে হচ্ছে। রেশমি রিকশার খোঁজ করল। জীবনে প্রথম এত রাতে সে বাড়ির বাইরে, আর বৃষ্টির ছাঁটে হাঁটা বড়ই মুস্কিল।

বাইরে মেঘগুলো যেন নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। তার মধ্যে বজ্রপাতের আওয়াজ যেন পরিবেশতাকে আরও ভয়ংকর করে তুলেছে। বিপদের ওপরে বিপদ - একখানা রিকশাও নেই। অগত্যা, হেঁটেই যেতে হবে। স্টেশনের বাইরে হাঁটু সমান জল, লোডশেডিং। অন্ধকারে বাইরে রাস্তা ঠাওর করে চলা দুর্বিষহ। ছাতা না আনার জন্য সে নিজের মনে ধিক্কার দিল। বাইরে বেরিয়ে কোন দিক দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছবে তাই ভাবছিলো, হঠাত্ দেখে রাস্তার ওপার থেকে কেউ যেন ছাতা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও পরে সেই কটকী জামা দেখে চিনতে পারলো।

- এত রাতে কে তোমায় আসতে বলল, এই ঝড়বৃষ্টি, আক্কেল কবে হবে?

- মামণি আমি তো প্রায় এক ঘন্টার উপর দাঁড়িয়ে আছি। আমি জানতাম যে তুই ছাতা নিয়ে যাসনি আর এত রাতে রিকশা পাবি না। তাই ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। চল আমার সাথে।

আজ সকাল থেকেই রেশমির মেজাজ ভালো ছিলো না। অফিসে বস দু-চারটে কঠিন কথা শুনিয়েছে। কিন্তু এত রাতে বাবাকে ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে খারাপ লাগাগুলো কেটে গেল। কথা না বলে চুপচাপ বাবার হাত ধরে চলতে লাগলো। ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময় রেনি ডে হলে বাবা এইভাবে ওর জন্য বাইরে অপেক্ষা করত| সে স্কুল থেকে বেরিয়ে ইচ্ছে করে বাবার কথা না শুনে ছাতার বাইরে বেরিয়ে যেত এবং বাবার বকুনিতে আবার ফিরে আসতো। অন্ধকারে আজকে আবার সেই হারিয়ে যাওয়া দিনে ফিরে যেতে ইচ্ছে হল। ইচ্ছে করে সে বারবার ছাতার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল- এইবার কিন্তু ওর বাবা আর বকল না। একটা দোকানে সে রোজ রাতের খাবার নেয়। আজকে বাবার সাথে চলতে চলতে সে ভুলে গিয়েছিল। বাবা বলল- মামণি খাবার নিবিনা,লোকটা হয়তো তোর জন্য অপেক্ষা

করছে। বাবার কথায় রেশমি বাস্তব জগতে ফিরে আসে। সে বলল-না বাবা এত রাতে মধুকে আর ডাকব না, হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়িতে যা আছে কিছু একটা করে নেব। এইভাবে চলতে চলতে কখন যে বাড়ির সামনে চলে এসেছে খেয়াল করেনি।

কলিং বেলের বাজাতেই ওপাশ থেকে সুজাতার আওয়াজ এলো। সুজাতা রেশমির বন্ধু। সুজাতা মোমবাতি নিয়ে দরজা খুলে বলল - চায়ের জল বসাচ্ছি, তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করে নে, পুরো ভিজে গেছিস দেখছি।

- তিন কাপ বসাস, বাবা এসেছে।

- বাবা ?! কী যা তা বলছিস...তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

- বাজে বকিস না,আমাকে ছাতা নিয়ে বাড়ি অব্দি ছেড়ে দিল, দেখ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

- শর্মিলা .... সুজাতার গলার স্বর এবার বেশ জোর - কি বলছিস তুই ?

একটু ছোট্ট ভূমিকম্প হলো কি ? রেশমির চোখ পড়ল ডান দিকের টেবিলের উপর রাখা ছবিটার দিকে। সেই কটকী জামার সাথে রজনীগন্ধার মালাটাও দেখা যাচ্ছে। দৌড়ে বাড়ির বাইরে এসে সে দেখতে পেল দূরে একটা ছায়া যেন মিলিয়ে যাচ্ছে, অনেকটা বাবার মতো। রেশমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে বৃষ্টির সাথে সাথে তার চোখেও বৃষ্টির ধারা নেমে এসেছে।

রেশমির মা বাবা দুজনেই বছর দুই আগে মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

সূচীপত্র

সত্যি ভুতের ঘটনা

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

সাতানব্বই সালের বর্ষাকালের এক সন্ধেবেলা, সময় প্রায় সাড়ে নটা। টিউশন পড়ে হেঁটে চলেছি বাড়ির দিকে। বেশ কিছুটা পথ রেল লাইনের উপর দিয়ে গিয়ে সময় বাঁচাই। দুর থেকে টাওয়ার লাইটের আলো যা পড়ে, স্পষ্ট করে কিছু দেখা না গেলেও হাঁটতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু মুশকিল হল কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। ছিটেফোঁটা তখনও হয়ে চলেছে, যদিও ছাতা তখনও খুলি নি। রেললাইনের পরপর স্লিপারের উপর পা রেখে হাঁটছি। আচমকা লক্ষ করলাম যখন থেকে মাটি ছেড়ে রেল লাইনে উঠেছি মনে হচ্ছে কেউ যেন ঠিক আমার পেছনে হাঁটছে। ভয় পেলাম এইটা আবিষ্কার করে যে দুরত্বটা যেন একই রয়েছে। পেছন ফিরে দেখলাম - নাহ কেউ নেই। পায়ের আওয়াজও বন্ধ। আবার হাঁটা শুরু করলাম, এবার একটু স্পিডে। চমক লাগল এটা বুঝতে পেরে যে পেছনে যে অদৃশ্য জন হাঁটছে তার স্পিডটাও বেড়ে গিয়ে দুরত্ব যেন এক রেখেছে, আর সেটা হচ্ছে ঠিক আমার অল্প পেছনে। ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আবার, চারদিকে চেয়ে দেখলাম - কেউ কোত্থাও নেই। আবার হাঁটতে লাগলাম, আবার সেই এক অনুভূতি। নাহ্, এভাবে চলতে পারে না। মনে খুব রাগ হতে লাগল, বাঁচব কি মরব জানি না, কিন্তু ফয়সালা একটা করতেই হবে। দাঁড়িয়ে সোজা পেছন দিকে ঘুরলাম। দাঁতে দাঁত চেপে বল্লাম - সত্য না জেনে পালাচ্ছি না।

গল্পে সময়ের চাকাটা ঘুরিয়ে দিলাম। সময় দু হাজার আঠারো, এক পুরনো বন্ধুর সাথে সন্ধ্যাবেলা মাঠে বসে আড্ডা দিচ্ছি। কথায় কথায় ভুতে বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উঠে এল, বন্ধুটি বলতে লাগল - তোর তো সবেতেই অবিশ্বাস, ভুত নিশ্চয়ই মানিস না। আমিও একসময় মানতাম না, কিন্তু আমার সাথে যেটা ঘটেছিল সেটা শুনলে তোরও বিশ্বাস জন্মে যাবে। শোন তাহলে বলি, এই বলে সে বলতে শুরু করল ' প্রায় কুড়ি বছর আগের ঘটনা, গ্রামের বাড়িতে কোন এক কাজ উপলক্ষে বাবা, মা, বোন আগেই চলে গেছে ওখানে, আমি একদিন পর সন্ধ্যা নাগাদ গিয়ে নামলাম স্টেশনে। সেখান থেকে অনেকটাই হাঁটা রাস্তা, যার বেশ কিছুটা যেতে হয় রেল লাইনের উপর দিয়ে। একাই হাঁটছি, হঠাৎ মনে হল পেছনে কেউ আসছে। ঘুরে দেখলে কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। জোরে হাঁটলে সেও জোরে হাঁটে, আস্তে হলে সেও আস্তে হয়ে যায়। প্রচন্ড ভয় পেয়ে রেল লাইন থেকে নেমে পড়লাম পাশের ক্ষেতে। লাগালাম দৌড়। কোনমতে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি পৌঁছালাম, বাড়ির লোকজন তো আমার

অবস্থা দেখে আবাক ! জ্যাঠা মশাই ডেকে পাঠালেন গ্রামের ওঝা কে। পরীক্ষা করে ওঝা জানাল - কপাল জোরে এ যাত্রা প্রাণ বেঁচে গেছে, ভয়ংকর এক দুরাত্মা টার্গেট করেছিল। একটু দেরি হলেই প্রাণ নিয়ে নিত। শেষে একটা ভালো করে পুজো করে ওই ওঝা যেটুকু খারাপ হাওয়া লেগে ছিল গায়ে, তা কাটিয়ে দিল। '

চুপ করে গালে হাত দিয়ে গল্পটা শুনছিলাম। গল্প শেষ করে বন্ধুটা ঢোক গিলল। এবার আমি একটা প্রশ্ন করলাম - আচ্ছা একটা কথা মনে করে বল তো, ওই সময় বা তার আগে কি বৃষ্টি হয়েছিল ?

বন্ধুটি চমক খেয়ে বলল - তার কিছুক্ষণ আগে ওখানে বেশ ভালো বৃষ্টি পড়েছিল। আমি অট্টহাস্যে ফেটে পড়লাম, চোখের কোনায় একটু জলও চলে এল, মনে পড়ে গেল বছর একুশ আগের সেই রাত -

চারদিক ফাঁকা, মৃদু বৃষ্টি পড়ছে, হালকা আলো, আশেপাশে গাছ গাছাড়ি, আমি আর অদৃশ্য একজন মুখোমুখি। এক পা এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। আশ্চর্য, পায়ের আওয়াজ উঠল পেছন থেকে। এক পা পিছিয়ে গেলাম এবার, আবার অবাক হওয়ার পালা, শব্দ টা এল এবার সামনে দিক থেকে !! আবার দু পা পেছলাম - শব্দ এল সামনে থেকে, এগুলাম দু পা, শব্দ আবার পেছনে। ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকলাম নিচের দিকে। পা দিয়ে স্লিপারে চাপ দিতেই কাঠের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল জল, পা উঠাতেই আবার সেটা শুষে নিচ্ছিল ওই কাঠ, আর ঠিক শুষে নেওয়ার সময়ই যে আওয়াজ হচ্ছিল, ঠিক যেন পা ফেলছে কেউ।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। মনে হল ভুতকে হারিয়ে জয় করলাম এ যুদ্ধ। অনেক্ষণ ধরে যে মানসিক অত্যাচার করে চলেছিল ওই ভুত, পুরো খেলো করে রেখে দিলাম।

সূচীপত্র

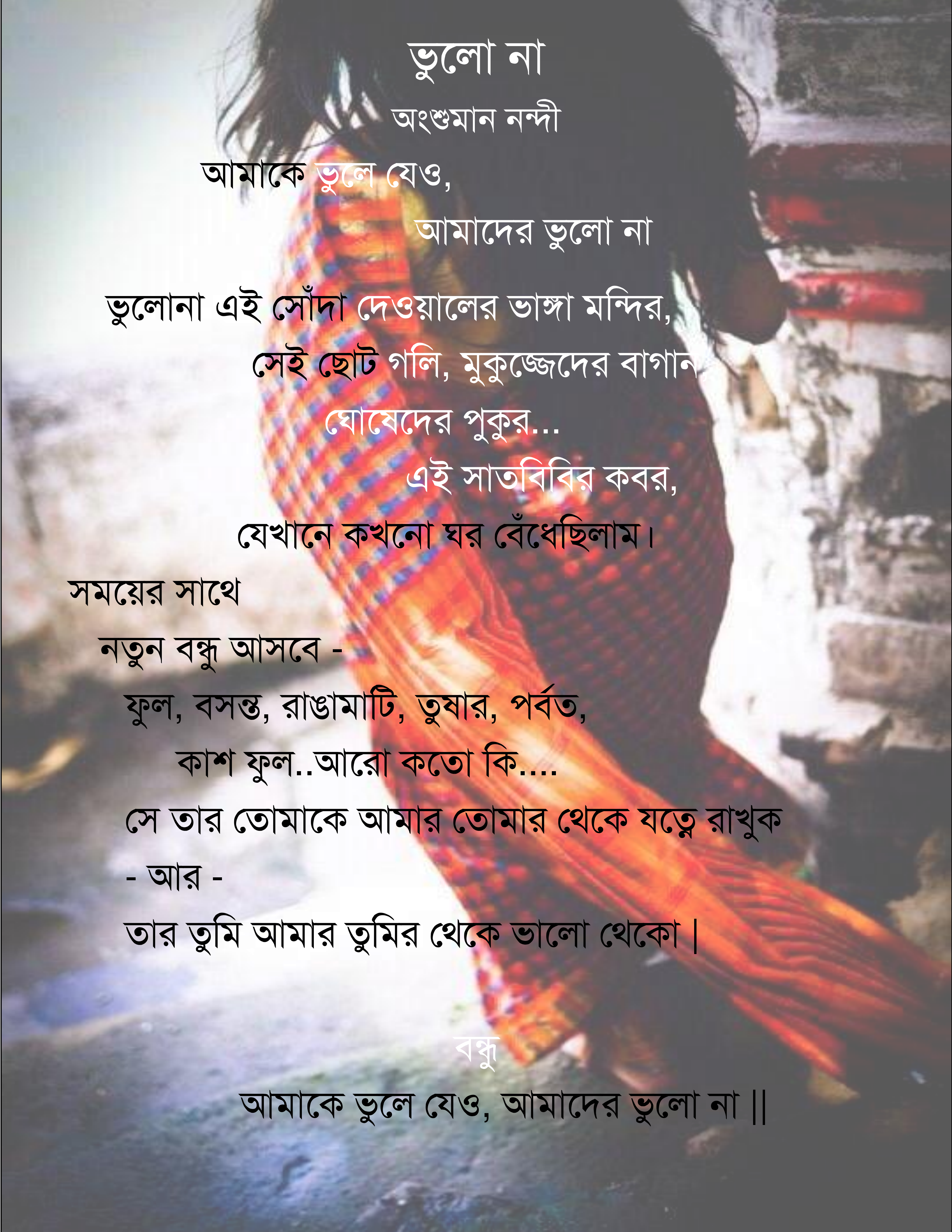

ভুলো না

অংশুমান নন্দী

আমাকে ভুলে যেও,
আমাদের ভুলো না

ভুলোনা এই সোঁদা দেওয়ালের ভাঙ্গা মন্দির,
সেই ছোট গলি, মুকুজ্জেদের বাগান,
ঘোষেদের পুকুর...
এই সাতবিবির কবর,
যেখানে কখনো ঘর বেঁধেছিলাম।
সময়ের সাথে
নতুন বন্ধু আসবে -
ফুল, বসন্ত, রাঙামাটি, তুষার, পর্বত,
কাশ ফুল..আরো কতো কি....
সে তার তোমাকে আমার তোমার থেকে যত্নে রাখুক
- আর -
তার তুমি আমার তুমির থেকে ভালো থেকো |

বন্ধু
আমাকে ভুলে যেও, আমাদের ভুলো না ||

ঋণ

চন্দন মাইতি

তখন, সময় ছিল, পসার ছিল না -
এখন কিছুই নেই।
সময় বন্ধক দিয়েছি কর্মস্থলে,
পসার গেছে লেনদেনে,
পড়ে আছে ব্যস্ততা।

হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে
কিন্তু, সেই অলীক স্থানের সন্ধান পাওয়ার আগেই
দেখি শিকড় চলে গেছে বহুদূর।

সময়ের সাথে, অজান্তে, কখন নিজের সময় ভাগ হয়ে যাচ্ছে
পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, স্বার্থপর হয়ে যাই।

এখনো তো আমার সময় শেষ হয় নি, এখনো যেতে হবে বহুদূর,
সীমাহীন আলোকছটার গন্ডি পেরিয়ে।

আমি বসে থাকি নীল স্ক্রিনে, প্রজন্ম ডোরেমন-এ।
আমার অপরিপূর্ণ সময় ছিনিয়ে নিচ্ছি তাদের শৈশব থেকে,
বদলে ভরে দিচ্ছি মায়াজালে-র বিষ,স্বচ্ছ বিশুদ্ধ মনে।

এ ঋণ কি শোধ হবে কোনোদিন?

সূচীপত্র

কার পৃথিবী

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

এই পৃথিবী কার!
কার বাবা ভাগ করেছিল এই পৃথিবীর জমি,
বলেছিল এটা আমার আর তোমার ওদিক টা।
পৃথিবীকে সম্পত্তি বানিয়েছিল কার বাপে ?
আর সম্পত্তির বাঁটোয়ারা করেছিল কিসের জোরে ?
গায়ের জোরে ? বুদ্ধির জোরে?
আমার নেই - জোর, না দেহের না বুদ্ধির,
এটাও তো স্বাভাবিক, এটাও তো নির্ভুল।
তবে সম্পত্তির ভাগ কেমন করে পাব আমি !
কেন আমার মত দুর্বলের ভাগে কেবল বঞ্চনা ?
দুর্বলের পাশে দাঁড়াতে কারা আসে ,
যারা নিজেদের বলে মানবিক, কিন্তু,
তারাও পারেনা দিতে সেই উত্তর,
কার বাবা ভাগ করে এই পৃথিবী ?

কার রাস্তা, কার জমি, কার জঙ্গল,
কার ভুমি? কার আকাশ, কার পাহাড়-পর্বত?
কত বয়স তোমার মানব জাতি?
জানো কি কত বয়স এই পৃথিবীর!
জানো কি তোমার যাওয়ার পরেও,
থেকে যাবে সব, এই সব কিছু যা দেখছ।
কেবল থাকবে না তুমি, হে মহান মানব
জাতি।
বল এবার কোনটা তোমার ভাগে ?
শুনছি এবার চাঁদেও পাড়ি দিচ্ছো ,
এবার বুঝি ভাগ করবে চাঁদ টা!
তোমার মৃত্যু হবে জেনো নিশ্চিত,
কারো বাপের সাধ্যি নেই যে আটকায়।

পরাজিত সৈনিক

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

দুটো পাহাড়, মাঝে সূর্য, উপরে কয়েকটা মেঘ,
সামনে আঁকা বাঁকা রাস্তাটা, এগিয়ে এসে চওড়া হয়ে গেল,
মনে আছে ছবি টা, ছোটবেলায় আঁকা !
অথবা সেই নৌকাটা, একদিকে কাত হয়ে ভাসছে।
আর সেই কবিতাটা - "জীবন যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক" ?
তারপর কি হল ?
সৈনিকের ? জিতল কি শেষে ?
না কি এখনও গুহাতে মাকড়সার ওঠা নামা !
নৌকাটা ডুবল ? না কি উঠল ভেসে কোন এক পাড়ে?
সূর্য টা কি দেখা যায়? নাকি ডুবে গেছে কারখানার ধোঁয়ায়!
রাস্তাটার দুদিকে কি সবুজ ঘাস আছে ?
না কি বড় বড় ঘর বাড়ি উঠেছে দু পাশে ?
হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল দার শহরটা কি এখনও ওমনি আছে !
রেস্তোরাঁ তে এখনও কাটলেট খাওয়া !

কে জানে এখন লোকের ভালো করে,
কত টাকা পুরস্কার পায় ওরা !
কম্পিউটারের চেয়েও যার বুদ্ধি বেশি ছিল,
সে লোকটা করছেটা কি এখন !

ওসব বুদ্ধি এখনও কি লাগে !
বিপদে পড়ে কে তার কাছে যায় ?

হাতিরামের মার খেয়েও দুটো চুপচাপ !
নিউজ চ্যানেল জানতে পারলেই হচ্ছে ।

এসব কথা ভাবতে যেও না একদম ,
দু এক জন এগিয়ে গেল বলে।
দাঁড়িয়ে থাকা মানেই সময় নষ্ট ,
এ সব কথা ভাবলে কি আর চলে!

তবু মনে লাগে কখনও খটকা,
বিলির বুট-টা এখনও কি আছে !

জয়ী

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

যখন তুমি হেরে গেছো, দাঁড়িয়ে শোন জেতার হুঙ্কার।
যখন তুমি হেরেই গেছো, তোমায় দেখতে হবে জয়ীর আস্ফালন।
তুমি তো জিততে পারতে, সেকথা আর বিশ্বাস করবেনা কেউ।
তুমিই তো জিততে পারতে, হোল না আর বাস্তবের বাস্তবায়ন।

যে জিতল সে কি তোমার চেয়ে বেশি, ইতিহাস তো সেটাই লিখে রাখবে।
ইতিহাস টা বদলাতে পারতে, সে পারাটাও ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে।
জেতা টা খুবই সোজা ছিল হয়তো , সোজাটাই তো না পারা হয়ে রইল ।
বুকের ভেতর আগুনটা কি জ্বলছে, জ্বলছে যখন হারোনি হয়তো পুরোটা।
সূযোগ যদি আসে আর একবার, জয়ীকে তবে লড়াইটা শিখিও।

গোটা ডিম

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

হাসতে হাসতে যে ছেলেটা পেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে,
কেউ কি জানে খুশি কেন সে, কেন আছে ফুর্তিতে!
যদিও তার চটি ফাটা, কাঁধ থেকে ব্যাগ ঝুলছে আধা,
স্কুলের জামা নোংরা আর চুলগুলো সব এলোমেলো।
যদিও তার গালে দাগ আর হাঁটুর মাঝে ধুলো লেগে,
ব্যাগের চেনটা খারাপ হয়ে আধখানা ব্যাগ আছে খুলে।
ঘর হয়তো অনেক দুর, যাচ্ছে হেঁটে একলা সে,
কিন্তু জানি হাসছে কেন, নাচছে কেন মাঝে মাঝে!
আজ যেন সে সব পেয়েছে, আজ যেন সে একাই রাজা,
আনন্দের বাঁধ ভেঙেছে, আজ যেন সে বেপরোয়া।
কাছে গিয়ে জানতে পেলাম কি তার এত খুশির কারন,
আজকে গোটা ডিম পেয়েছে খাবার পাতে দুপুরবেলা।

ছক

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

কে বেশি বুদ্ধিমান ?
ওই যে ছক দেখছো, ওতেই দেওয়া আছে।
কে বেশি সফল!
ওই তো সব ছকেই তো আছে।

আচ্ছা আচ্ছা, পারি নি গো বুঝতে।
রাগ যদি না কর, বলবে একটা কথা -
আচ্ছা কে বেশি সুখী ?

ওহো, দেওয়া আছে তো ওই ছকে -
খালি হাজার প্রশ্ন, দেখনা ওতে মিলিয়ে।

দেখছি গো দেখছি, মিলছে না তো মোটে!

তবে তোমার চোখ দুটো গেছে,
সবার যাচ্ছে ওই হিসেব মিলে -
খালি তোমার যত অসুবিধে হচ্ছে।

আচ্ছা বেশ, আমরই ভুল হবে,
আচ্ছা তবে কোন পথে হাঁটবো !

সেও তো দেওয়া আছে ওই ছকেই,
না দেখেই চ্যাঁচাও খালি দেখছি।

ভুল পথে চলেছি গো তবে,
ওরকমই ছকে যে দেখাচ্ছে।

আচ্ছা বলো কোনটা সঠিক?
বেঠিক ই বা কোনটা?
সেটাও কি ওই ছকেই খুঁজব,
যা দেখছি, অবাক হচ্ছি শুধু,
মিলছে না কোন হিসেব মোটে।

আমার পছন্দ, আমার পছন্দ নয়,
ছক বলছে আমার পছন্দ অন্য।
হঠাৎ হঠাৎ হিসেব যাচ্ছে বদলে,
সাথে আমায় বদলে যেতে বলছে।
যে বোঝা টা ছকের সাথে মিলছে,
সবাই দেখছি সেই বোঝাটাই বুঝছে।

ক্লান্ত হচ্ছি ছক মিলিয়ে চলতে,
হাসছে সবাই আমার দিকে চেয়ে।
কেউ বলছে বোকা, কেউ বলছে পাগল,
কেউ বলছে অদ্ভুত এক জীব।

ছকটা বড় কঠিন লাগছে আমার,
তাল কেটে যাচ্ছে বারেবারে।
আমি বরং আমার পথেই হাঁটছি,
ছকটাকে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে।

যে যেটা বুঝল সেটাই বুঝুক,
ছক আমি আর মানছি না মোটে।

তুমি আর আমি

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

নই আমি তোমাদের উপর নির্ভরশীল
বুঝতে কোনটা সঠিক ,
যতই সংখ্যাতে তোমরা হও না অধিক,
যতই হই না কেন আমি নিঃসঙ্গ ।
যতই ভাব না আমাকে তোমরা অজ্ঞ,
আমার রুচি একান্ত যে আমারই ।
স্নান সম্পুর্ণ করে স্নাতক হওয়া যায়,
সে স্নান যদি মনের পরশ পায় !
মূল্য যদি বোধগম্য হয়, মূল্য কত কার !
কথার, ভাবনার, আবেগের, ক্রিয়ার,
সে বোধ বড় আপনার, বড় ব্যক্তিগত,
সে বোধের এসে যায় না কিছু
তোমাদের রাগে, ঘেন্নায়, অবাক হওয়াতে।
সংখ্যা গরিষ্ঠ মানেই সঠিক নয়,
সংখ্যা লঘু মানেই নয় ভুল ।
যে বোধ আসতে নিয়েছে অনেক সময়,
সে বোধ কি এমনি চলে যায় !

সব লড়াই তো জেতার জন্য নয়,
সব স্বপ্ন সত্যি কখনো হয় না, তবু
এমন একজনকে বড়ই দরকার, সবসময়,
যে স্বপ্ন দেখতে জানে, যে লড়াই করে,
হোক সে বিফল, হোক সে ভুলে যাওয়া ইতিহাস,
তবু দরকার ভিড়ের মাঝে এমন একজন,
নতুন কিছু, অন্য রকম ভাবতে যে জানে।
আজকে যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর
ইতিহাস নাও পারে মেনে নিতে ,
আবার ক্রোধের গরলে হয়ত
লুকিয়ে আছে ভালোবাসার বীজ।

সূচীপত্র

আশা

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

ওরা বলে সব কিছু নাকি শেষ হয়ে গিয়েছে,
ওরা বলে আমাদের মত গোটাকয়েক এখন নাকি আশ্চর্য !
অবাক হয়ে ওরা বলে, ওরা জানেনা এখনো কত স্বপ্ন,
কত স্বপ্ন সযত্নে বুনে চলেছি আমরা।
হাসি মুখে মেনে চলেছি কালের নিয়ম,
আপোষ করছি কত কুণ্ঠা, কত দ্বিধার কাছে,
চলমানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে, ভুলেছি বারুদের গন্ধ,
বন্দুকের নল ! শুনি না বসন্তের ডাক ।

যারা শেষ হওয়ার সময় করেছিল আশা,
তাদের হেরে যাওয়া দেখে শিখবে পরের জন,
তারা এখনো রাতে ঘুম ভাঙাতে আসে,
তারা আয়না তুলে ধরে, তারা বলে,
তারা জিজ্ঞেস করে সবই কি গেল ফুরিয়ে ?
জানেনা তারা গুটি কতক আছে এখনও,
এখনও বুকে আগুন জ্বলে।
খুঁজে বেড়াই নিষিদ্ধ লিফলেট, যদি কোন কানাগলি
বা জঙ্গলে ঝোপে-ঝাড়ে খুঁজে পাই এক দুটো!

যদি পাই খুঁজে, হয়তো আগুনের তাপ পাওয়া যাবে,
কত আশা নিয়ে কেউ ছুঁড়ে দিয়েছিল একদিন, ওঠাতে ঝড়,
হয়ত তখন আবার ঝড় উঠবে, চাবুক আবার গর্জে উঠবে,
কিছু মানুষের বুকে আবার ভয়, লুকোনো দাঁত আবার বেরোবে।
ব্যথা তো আমরাও পাই, চুপ করে যাই, গম্ভীর হয়ে,
যখন ভেসে উঠে সাদা ফতুয়ার পেছন দিকে লাল দাগ,
মনের মধ্যে, তখন অস্ফুট এক যন্ত্রণা কুরে কুরে খায়।

শুধু আবেগ দিয়ে কিছু মানুষ চলেছিল অল্প একটু পথ,
শত লম্বা পথকেও হার মানায় সে স্বল্পতা।

ওরা বলে সব কিছু নাকি শেষ হয়ে গিয়েছে,
ওরা বলে আমাদের মত গোটাকয়েক এখন নাকি আশ্চর্য!
তারা জানেনা, স্বপ্ন বুনি এখনো, এখনও আছে অনেক বাকি,
সমান্তরাল হতে চায় যে বিশ্ব, সমান্তরাল শ্রেণী বিন্যাস।

কুঁড়ে ভুত

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

এক ছিল কুঁড়ে ভুত, কাজ কম্মে নেই যে মন,
ভয় পাইয়ে পায় না মজা, যায় না কোথাও বেশি দুর।
কেউ কখনো দেখে ফেলে চমকে উঠে রাত দুপুরে, যদি
আঁতকে উঠে চ্যাঁচাতে যায়,
হুড়মুড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে সেখান থেকে ভূত পালায় ।

ভুতের রাজা ভীষণ চটে, রেগে মাথায় রক্ত ওঠে,
ধমক দিয়ে, ভালোবেসে, হাল ছেড়ে দিয়েছে শেষে।

ভাবে সে একলা বসে, এসে পড়ল এ কোন দেশে ?
মানুষ যখন ছিল সে, কত আরাম করত যে,
হিসেব তার নেই তো কিছু, কত সুখ না ছিল তার !

ভুতের এমন নিয়ম কানুন, শুতে দেখলেই রেগে আগুন,
আরাম করা চলবে না, মানুষ খোঁজ আর ভয় দেখাও ।

ভয় যদি না দেখায়, তাতেই বা কি এসে যায় ?
কিন্তু সেটা মানছে কে ! হাসছে সবাই ওকে দেখে ,
বলছে নাকি ভয় দেখালেই, ভুতের শক্তি বৃদ্ধি পায় !

যার যেমন ক্ষমতা থাকে , ভুতের শক্তি বাড়িয়ে রাখে ,
এটাই নাকি জাতীয় কর্ম, পালন করা অবশ্য চাই ।

নিদান দিচ্ছে ভুতের রাজা, বসে থাকলে পাবে সাজা,
হোক যত বিফল হবে , চেষ্টা করে যেতেই হয়।

কুঁড়ে ভুতের কষ্ট বাড়ে, কষ্ট নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে,
বলছে বলুক যার যা বলার, কুঁড়েমি তে লজ্জা নাই।
মনের কষ্ট মনেই রয়, শরীরের তো আরাম হয়।

এমনই এক সাত সকালে মামদো এসে বুঝিয়ে বলে,
মানুষগুলো বেদম পাজী, ভয় দেখিয়ে রাখতে হয়,
ভয় ওরা পাবে না যেদিন, ভুতের হবে বিনাশ সেদিন,
থাকবে কোথা, খাবে কি? দখল করে নেবে সবই ।
নজর যেথা পড়ে ওদের, সব্বোনাশ শেষ কথা কয় ।
ভুতদেরকে বেঘর করে, মারকাটারি করে মরে,
ভুতের সব্বোনাশটি করে, ভুতের দলে নাম লেখায়।

কুঁড়ে ভুতের মগজ খোলে, ভালো ভুতুমী গেল চলে ,
আসতে যেতে পথের ধারে, মানুষ পেলেই টনক নড়ে,
কুঁড়েমি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, লম্বা লম্বা হাত বাড়ায়,
মানুষরা তো চালাক বটে, অল্প দিনেই গেল রটে,
এখন ওই রাস্তা দিয়ে কম লোকেই পা মাড়ায় ।

সূচীপত্র

কেন যে এমন হয়

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

সবুজ ছিল রাতের স্বপ্ন গুলো,
ভাবনা গুলো ছিল এলোমেলো।
রঙিন ছিল চারপাশ , আর,
সোজা ছিল হেঁটে যাওয়া পথটা।
আলো ছিল অনেক দুর অব্দি,
পথ হারানোর ছিল না তো ভয়।
হাতটা ছিল বাড়ানো হাতের দিকে,
খেয়াল ছিলনা কখন যে কি হয়।
কত রাস্তা যাওয়া ছিল বাকি,
কতটাই বা এগিয়ে ছিলাম তখন !
অবাক চোখ, বোকা মাথায় যতদুর,
দেখেছিলাম গোলাপি ভবিষ্যৎ।
দেখেছিলাম লালের সাথে নীল,
দেখেছিলাম রং মেশানো আকাশ,
মিশে যায় সকাল-রাত্রি যেখানে,
কথা যায় কথার মাঝে হারিয়ে,
ফুলের গন্ধে প্রজাপতির নেশা,
মাতাল হয়ে খেত শুধু ঘুরপাক।
কবিতার জন্ম যে ভূমিতে,
সুখ বেচে ব্যাথা কিনতে হয়,
চলতে চলতে কখন যে পথে বাঁক,
পেছন ফিরতে সব গেল হারিয়ে।

মিলছে না কিছুই, সব হিসেব গেল গুলিয়ে,
এ কোন প্রকৃতি , এ কোন জগৎ !
এ কোন সুখহীন, কষ্টহীন, স্বপ্নহীন এক নতুন দিন,
না আলো, না অন্ধকার, না রং যায় চেনা,
পোড়া মোবিলের গন্ধ, ধূসর আকাশ,
জ্বলছে চারিদিক, কত কঠিন যাচ্ছে গলে।
হাত ফিরে এসেছে নিজ হাতে,
হাতে সময় ছুটছে খুব জোরে,
লাল, নীল সব মিশলে যে কালো,
বোকা মাথায় বুদ্ধি আসতে থাকে।
অবাক আর হয় না চোখ দুটো,
এখন শান্ত আর শ্রান্ত দুটো চোখ।
পথ থেকে বহু দুরে এসে,
বুঝতে পারি, নেই কোন সংশয়,
পথ হারানোর ভয় ছিল না বলেই,

হয়তো পথ, হারিয়েই গিয়েছিল ।

সূচীপত্র

সুপ্রভাত

সৈকত সাধু

প্রজন্মের সাথে প্রজন্মের রেখো না কোন বিরোধ
যা চাইছে সাধ্যের সেটুকু দিয়েই করো অবরোধ
তুমি যা করছো তার ভাগীদার করো আগামীকে
তোমার অতীতের সাথে স্বপ্ন মেলাবে প্রাত্যহিকে
নিজে করবে এক আর চাপিয়ে দেবে অন্য অনেক
ফাঁক খুঁজে সেও বেরিয়ে ধরবে বিপথের ভেক।
তার চেয়ে তার সাথে মিলেমিশে যদি থাকি আমরা
তবেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পাবে আমাদের এই ধরা ।

লেখাটা আমার আসে না

গৌতম বড়ুয়া

অরুনোদয়ের ফরমাইশ
লিখতে হবে কিছু
শারদীয়ার সংকলনে
ছাপবে মাথাপিছু
বহুকষ্টে মাথাঠুকে
পেয়েছি কিছু শব্দ
সেগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে
লিখছি এক পদ্য
নিজেই লিখছি নিজেই পড়ছি
দুইটি করে লাইন

মনে মনে ভাবছি বসে
এবার সবাই চাইবে মোর সাইন
কত প্রতিভা লুকিয়ে থাকে
কতজনের মনে
না ঠুকলে বেরোয় না সে
অরুনোদয় তা জানে
ভালো মন্দ জানি না বাপু
লিখেছি এই ঢেড়
প্রথম কবিতা জেনে সবাই
কোরো একে প্রেম।

রূপসী ছিলে হে মোর বাংলা
কইতে তুমি সে হেন কথা
আজ যেন হারিয়েছ সব গাঁথা
তোমারে খুঁজছি হেথা হোথা
পাইনি তোমায় তথা
অশ্রু ভেজা মন আমার চক্ষু যেন জরাজীন পাতা
কোথা গেলে তুমি হে আমার প্রাণের সোনার বাংলা

অঝোর ধারা

সৌমেন্দু সন্ন্যাসী

সেদিন ভোরে অঝোর ধারে
ঝরেছিলে তুমি,
বর্ষার শুভ সূচনাটা —
করেছিলে তুমি,
বাইরে তুমি বিরামহীন
অন্তরেতেও তাই—
তোমার মধ্যে নিজেকেই
বিলীন করতে চাই।
তোমার কষ্টে তুমি ঝরো
আমার কষ্টে আমি,
কষ্টটা যে কী? সেটা —
শুধু জানে অন্তর্যামী।

সূচীপত্র

জীবনানন্দের প্রতি

অরুনোদয় সিনহা

কবে তোমার ঘুম পেয়েছিল,
জানো কি কবি ?
তবে তোমার ঘুরে গেছে জীবন হতে
ধানের ক্ষেতের গন্ধ

প্রকৃতি কেন জাগিয়ে তোলে
কোন কোন ক্ষেত্রে ?
মানুষ শান্তিতে ঢলে পড়ুক,
নিশ্চলতার শান্তি
প্রকৃতি কিন্তু চায় মানুষ খেলুক,
খেলা করুক, উজানে ভাঁটায় -

স্মৃতিই আমার সত্ত্বা,
অতীতই আমার ভবিষ্যত
অতীতেই আমি পাই ভবিষ্যতের হদিস
আমি তো অতীতে নামবই

বর্তমান কেন আমাকে ডাকে ভবিষ্যতে ?
জানি না |

পশুরাও শান্তি চায়,
পাখিরা, কীটেরা
অর্ধবোধগম্যতার শান্তি
মানুষ কেন এত বোঝে ?

প্রকৃতি, তুমি কি বুঝবে মৃত্যু -
তুমি তো আছো অনন্তে,
আমরা অনন্তে নেই -
এই আমাদের বর্তমান|

কবি, মানুষ তুমি, নক্ষত্র নও
চিন্তা, স্বপ্ন ভুলে গিয়ে যে
অনন্ত নিশ্চলতার শান্তি
কোথায় পাবে তুমি ?

সহস্র বছর ধরে সোনালী ধান
দেখেছে নক্ষত্রের দীপ্তিমান মুখ
কিন্তু মানুষ তো বাঁচে না -
মৃত্যুও কি অভিমান নয় ?

সূচীপত্র

স্বপ্ন

নীলাঞ্জন অধিকারী

চলো, আমরা সন্ত্রাসবাদী হয়ে যাই সকলে,
হৃদয়ের অগোচরে, পাচার করি
আরেক হৃদয়|
কবি হবার দুঃসাহস স্বপ্নেও আনিনা,
কেননা ওঁরা কলমছাড়া, ছন্নছাড়া,
অথচ, তোমার হাতে আজ রক্তাক্ত গোলাপ
আমি সশস্ত্র, তোমার জন্য|
গত কয়েক দশক ধরে যে পথে
আমরা চলেছি, সহযোদ্ধার রতিবাসনাকে
উপেক্ষা করে, এখনো কুঁড়ে ঘরে
বুনে চলেছি স্বপ্নের লালসা -
চলো, আমরা মুজাহিদিন হয়ে যাই সকলে,
রক্তে মিশেছে ভালোবাসার লাল
এক দেশ থেকে আরেক দেশে, সীমান্ত পেরিয়ে
অন্য আকাশে ছড়িয়ে দিই
আমাদের ভালোবাসাগুলোকে |
পরমাণু বোমারা সব মুখ লুকোবে তোমার আঁচলে
কল্লোলিনী শহরের ফ্লাইওভার ডানা
মেলে হারিয়ে যাবে দলীয়রা সব |
মোতায়েন করি চলো, সারি সারি প্রেমিকের দল|
চলো, আরো একবার
আগুন হয়ে যাই সকলে
আগুনরা সব মিলে মিশে পাকদন্ডি বেয়ে
পুড়িয়ে দেবে বাসনার বেড়াজাল,
আমরা সকলে আলো জ্বালবো
স্বপ্নের রঙে
হৃদয়ে - হৃদয়ে ||

স্বাধীনতাকে

নীলাঞ্জন অধিকারী

অস্থিরতায় দিন কেটে যায়
শতক ঘরে নির্বিকার -
স্বাধীনতার পরশ মেখে
ঘুচুক মনের অন্ধকার ||

জাগছে আকাশ, জাগছে বাতাস
স্বাধীনতার দিব্যি থাক,
রাস্তার ওই ন্যাংটো শিশু
সকাল বিকেল খাবার পাক||

তোমার বুকে বাজলো সানাই
স্বাধীনতার বালাই ষাট
নেতার গলায় পদ্য আসুক
বন্ধ করে রাজ্যপাট ||

শরীর জুড়ে নখের আঁচড়
স্বাধীনতা তুমি শাস্তি দাও,
লজ্জায় সব পুরুষ ভুলুক
'ধর্ষণ' নামে শব্দটাও||

স্বাধীনতা তুমি, লেলিহান হও
কাশ্মীর থেকে দ্রাস
নতজানু হোক সীমান্তে তোমার
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস|

স্বাধীনতা হোক দিনের আলো -
স্বাধীনতা হোক ভোরের সানাই
দেশের নিলাম চুলোয় যাক
স্বাধীনতা, তুমি বাঁচার লড়াই|

দুচোখ দিয়ে আঁকছি ছবি
দিন বদলের রূপকথা
স্বপ্ন না হয় সত্যি হলো
প্রিয়তমাষু স্বাধীনতা ||

অহম ব্যানার্জী
বয়স ৭ বছর, শ্রেণী-দ্বিতীয়
সল্টলেক শিক্ষা নিকেতন,
কলকাতা

অনিকেশ দাস
শ্রেণী-অষ্টম
ডিএভি পাবলিক স্কুল

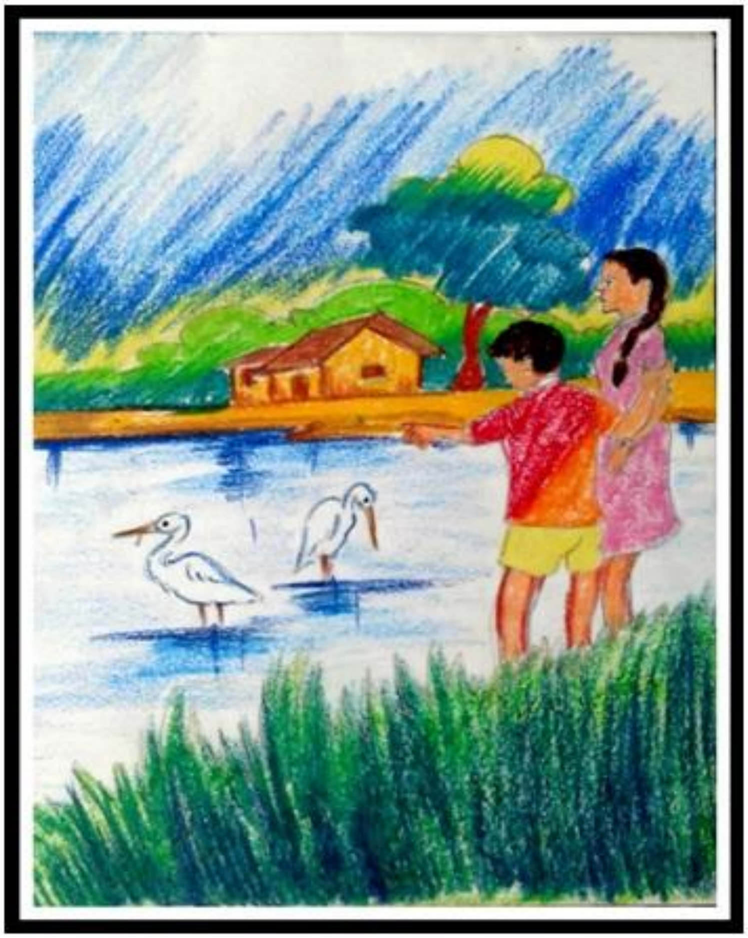

সূচীপত্র

অর্ঘকমল সিনহা, বয়স ৮ বছর, শ্রেণী - দ্বিতীয়
রামকৃষ্ণ মিশন, আসানসোল

সিদ্ধিক্ষা কৃষ্ণন,
বয়স - ৭ বছর, শ্রেণী - দ্বিতীয়
এ জি চার্চ আসানসোল

সি
দ্ধি
ক্ষা

কৃ
ষ্ণ
ন

সি
দ্ধি
হ্মা

কৃ
ষ্ণ
ন

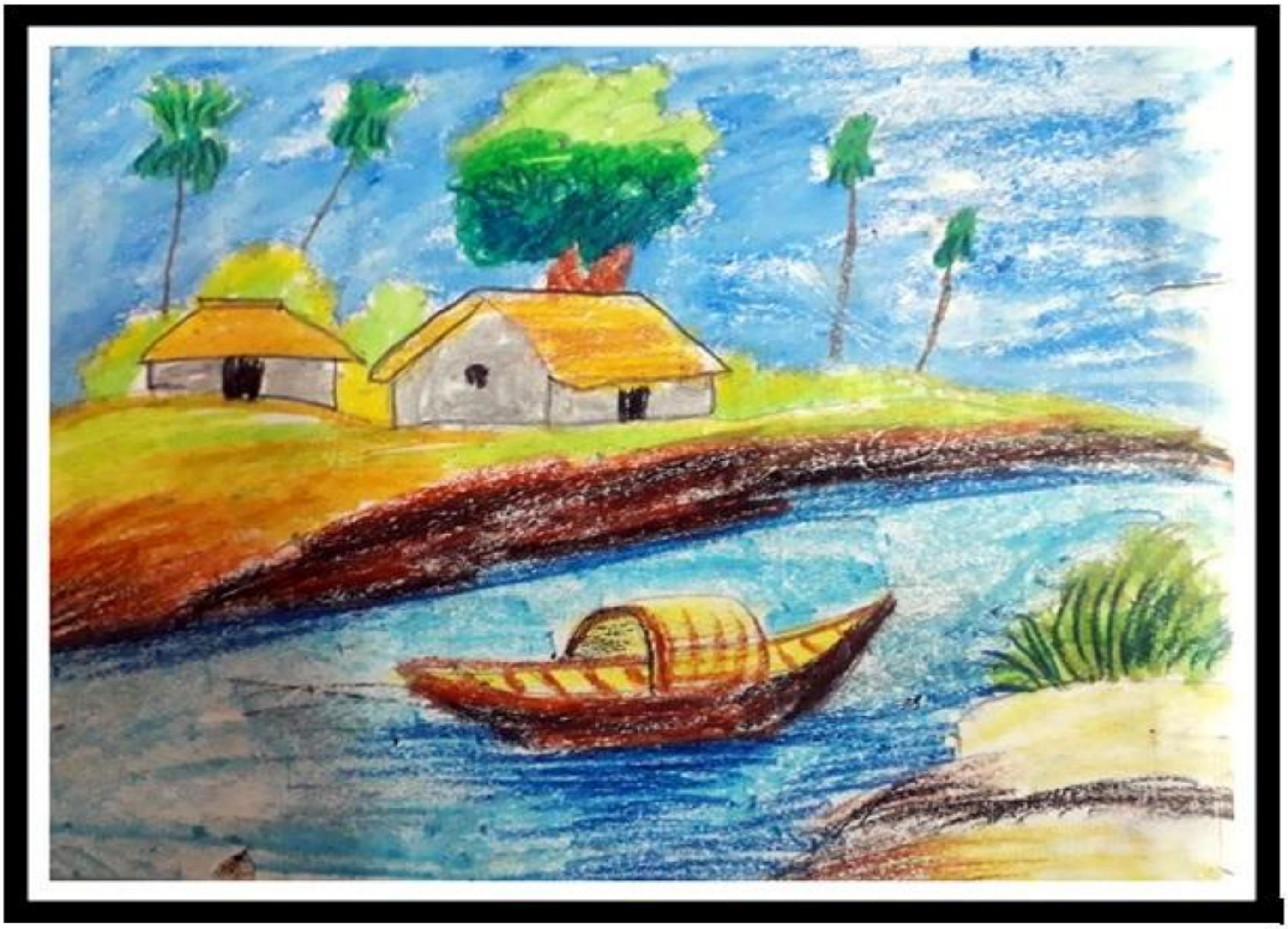

সূচীপত্র

সোহিনী পাল

বয়স ৮ বছর

শ্রেণী দ্বিতীয়

সূচীপত্র

সোহিনী পাল

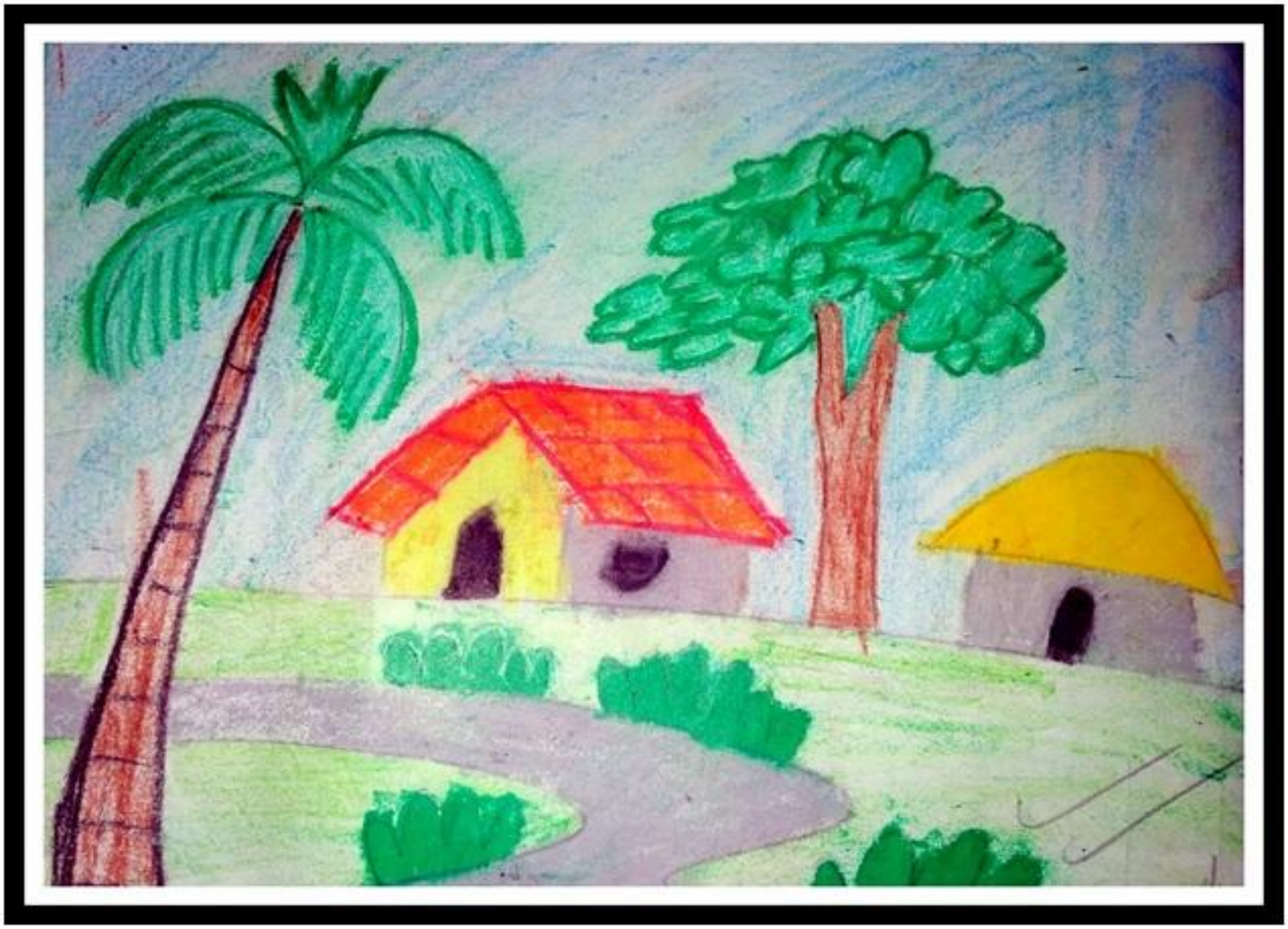

রিক্তম সাধু
বয়স - ৫ বছর
শ্রেণী - আপার কিন্ডারগার্ডেন
ডিবিএমএস স্কুল, জামশেদপুর

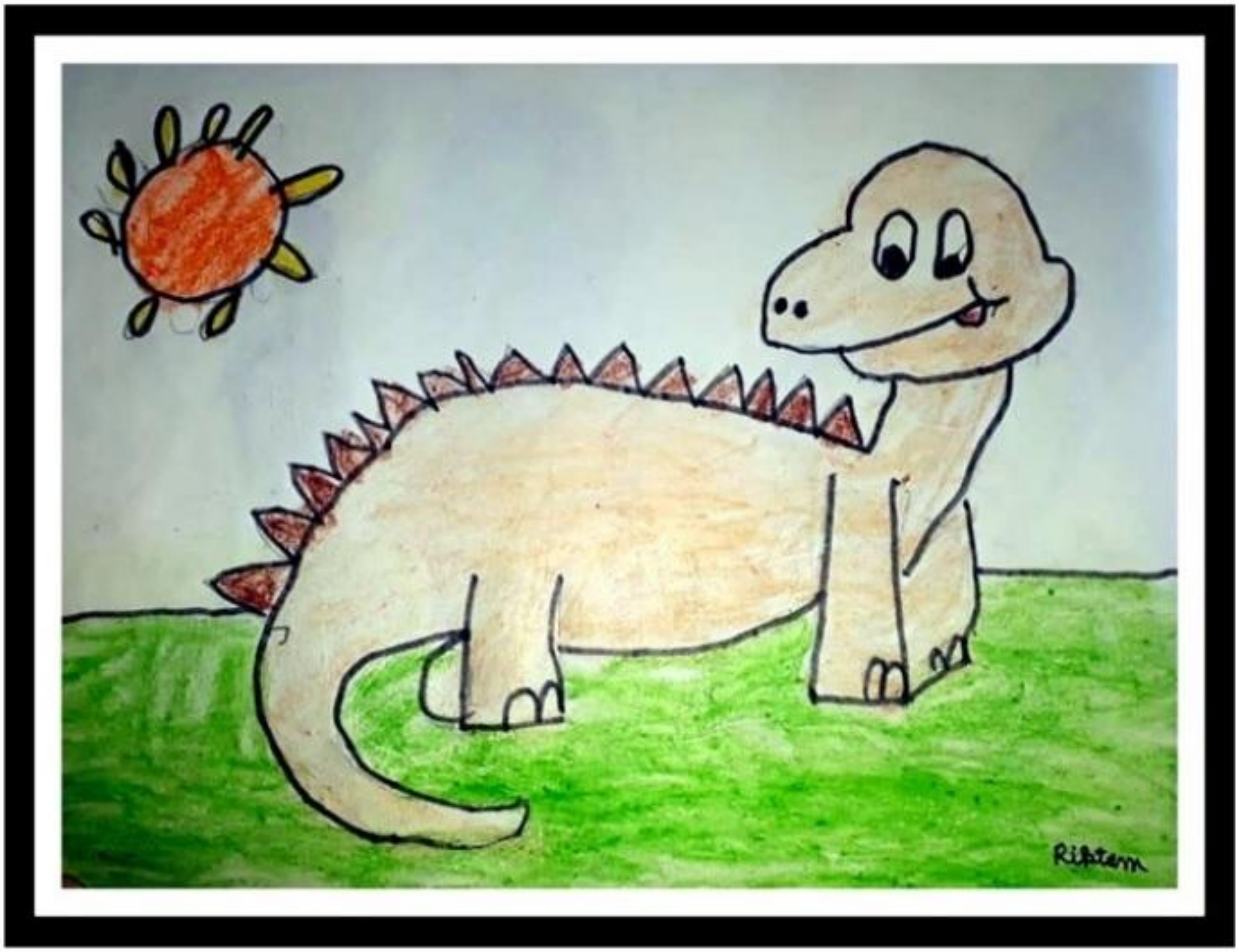

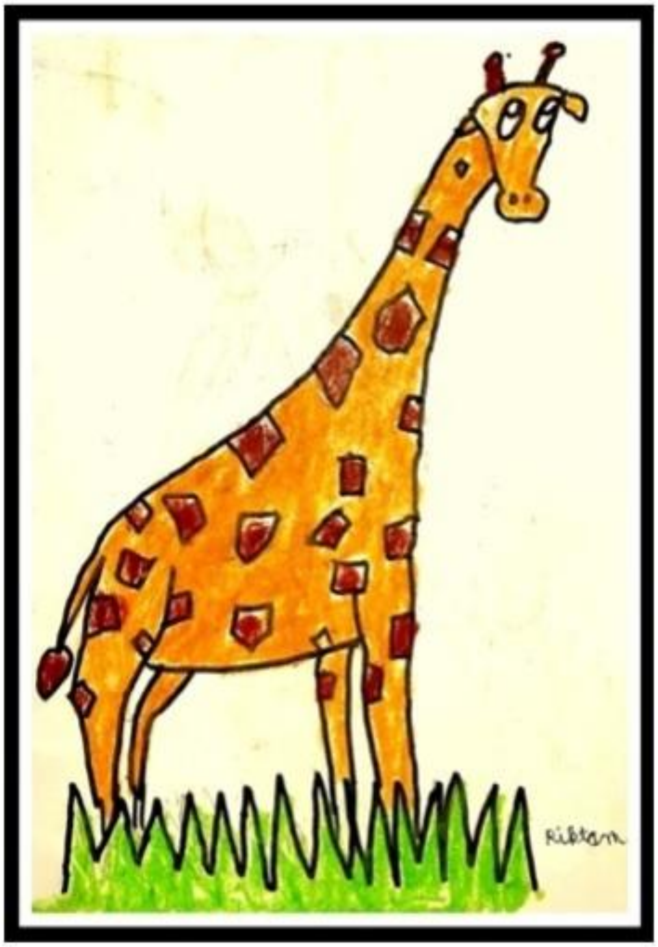

রিক্তম সাধু
বয়স - ৫ বছর
শ্রেণী - আপার কিন্ডারগার্ডেন
ডিবিএমএস স্কুল, জামশেদপুর

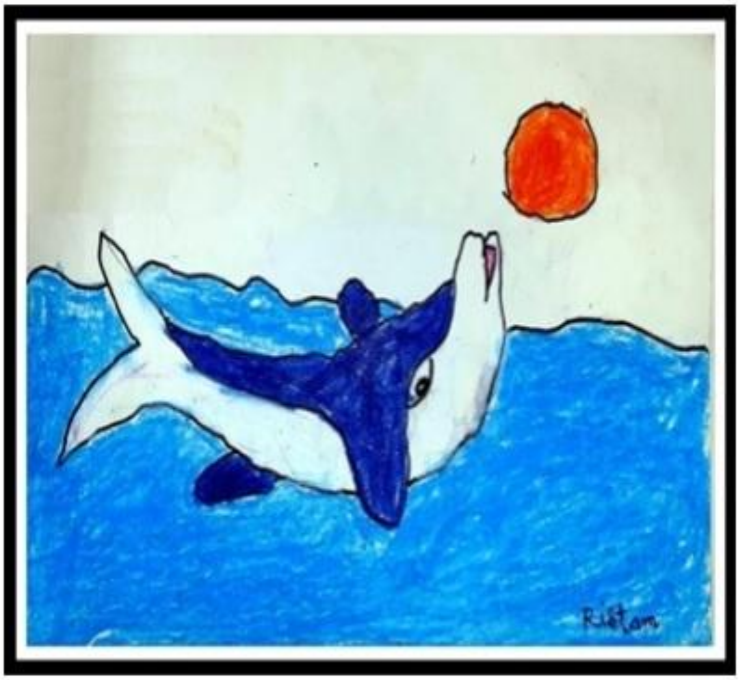

নৈঋত অধিকারী, বয়স ৮ বছর, শ্রেণী - দ্বিতীয়
রামকৃষ্ণ মিশন, আসানসোল

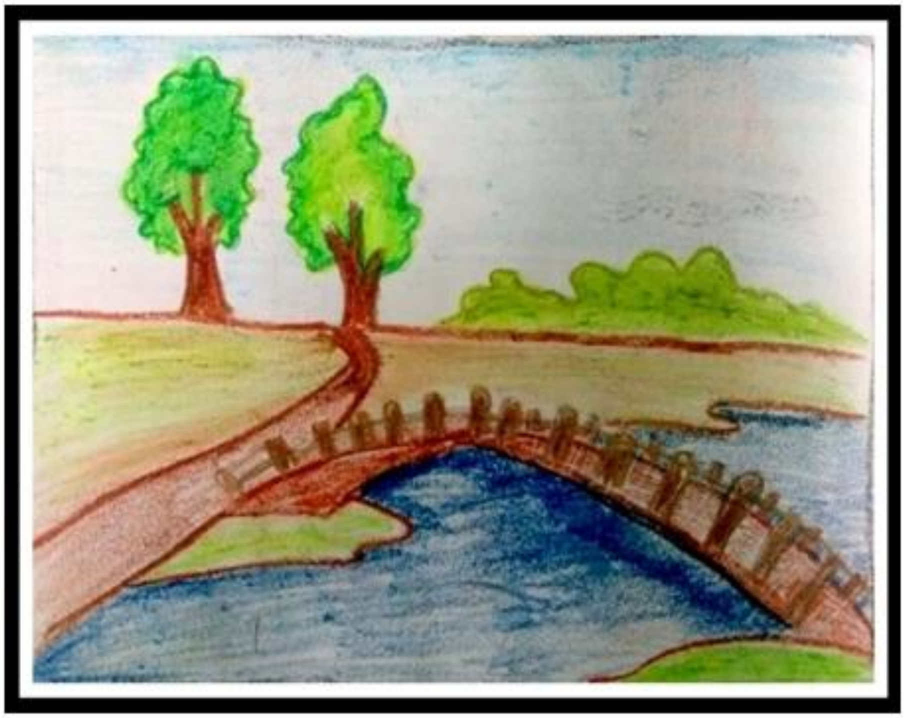

শ্রীজাতা আচার্জি , বয়স - ৭ বছর, শ্রেণী দ্বিতীয় , ডিএভি মডেল স্কুল

শুভশ্রী আচার্জি, বয়স ১০ বছর, শ্রেণী- পঞ্চম, , ডিএভি মডেল স্কুল

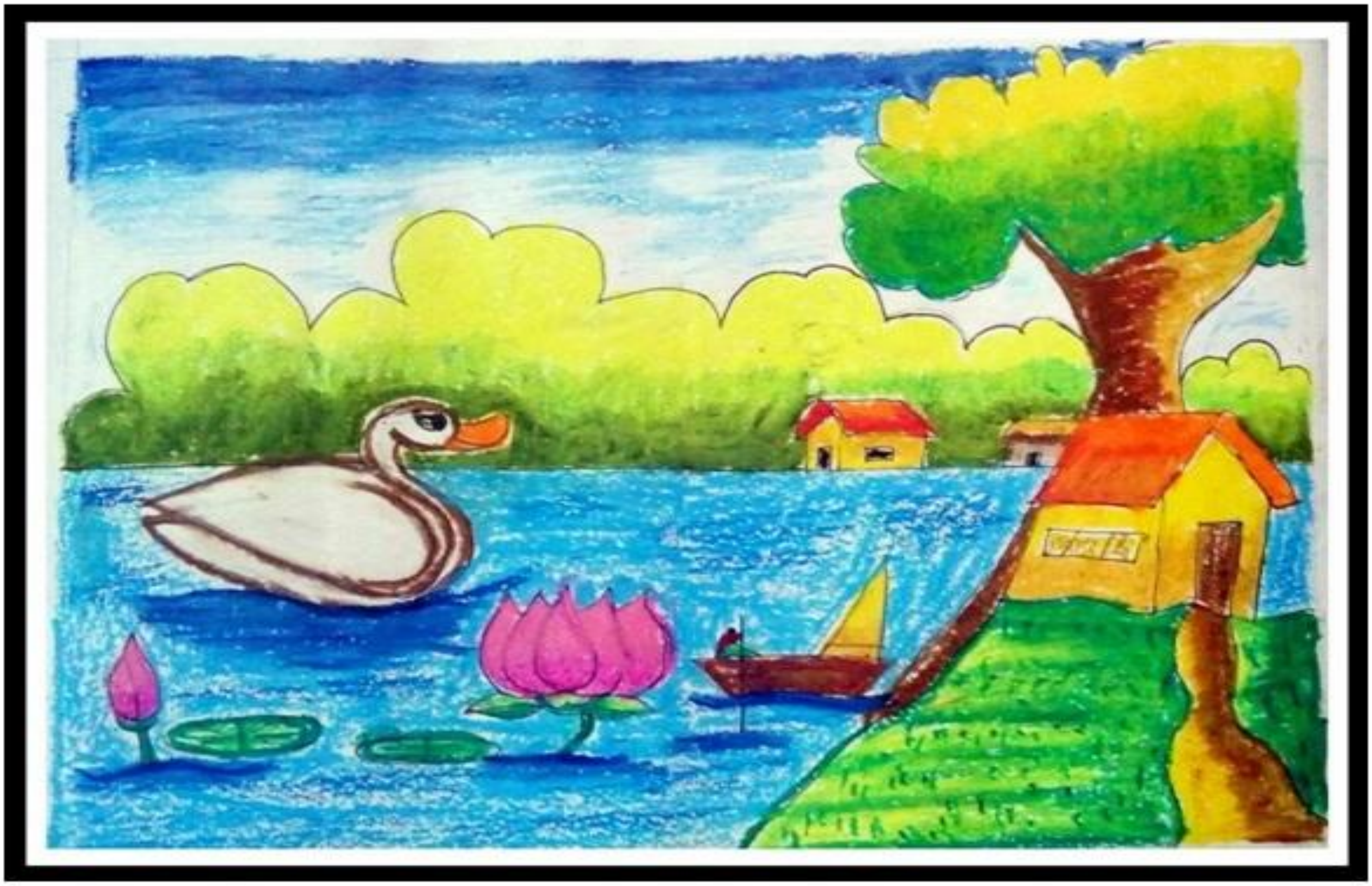

শ্রেয়সী আচার্জি, বয়স - ১০ বছর, শ্রেণী - পঞ্চম, প্রণবানন্দ স্কুল, দুর্গাপুর

অদিত্রী নন্দী, বয়স - ৬ বছর, শ্রেণী - প্রথম, শ্রীকুমারনস স্কুল, বেঙ্গালুরু

তিতাস মুখোপাধ্যায়,
বয়স - ৯ বছর, শ্রেণী - তৃতীয়,
এ জি চার্চ, আসানসোল

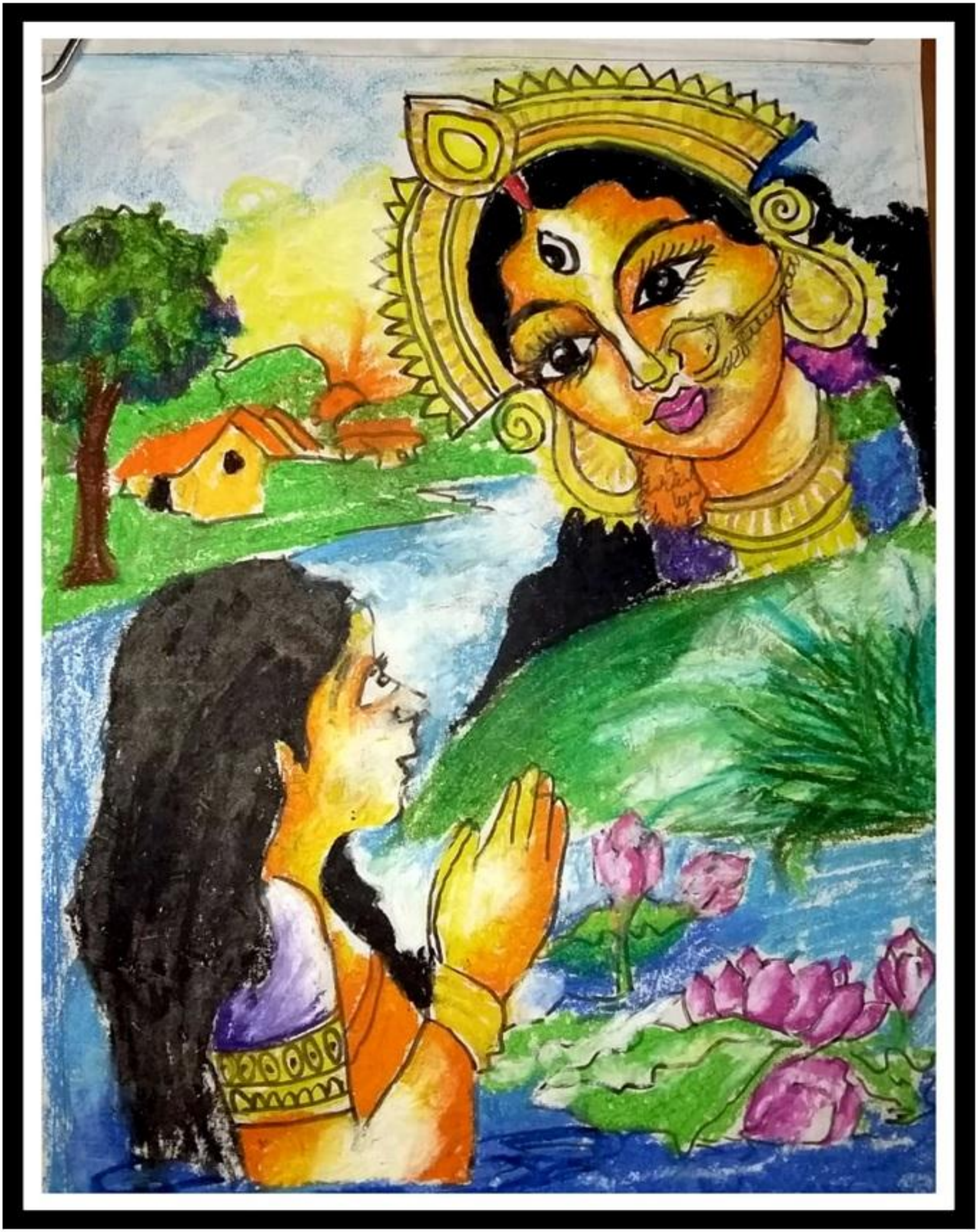

রাজদীপ মুখার্জ্জী, বয়স - ১৩ বছর, শ্রেণী - অষ্টম ইস্টার্ন রেলওয়ে স্কুল, আদ্রা

অর্ঘকমল সিনহা, বয়স ৮ বছর, শ্রেণী - দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ মিশন, আসানসোল

কবিতা ১

দাও কি তুমি গড়াগড়ি?
যোগাযোগ করো সরাসরি|
কখনও হবে না মারামারি,
আমার আছে মস্ত বাড়ি -
চেপে আমি ফিয়াট গাড়ি
সাতসমুদ্র দেব পাড়ি
গাধার বোঝাটা বড্ড ভারী |
এবার থামুন, ভেরি সরি !!

কবিতা ২

রাঁচি গেলে হয়না হাঁচি
দূষিত হাওয়া থেকে বাঁচি
দুধের হাঁড়ি বসে চাঁছি
রাঁচি গেলে হয়না হাঁচি !

স্বচ্ছ ভারত

অর্ঘকমল সিনহা

বেড়ে গেলে রাস্তায় গাড়ির চলাচল,
বাড়ে রাস্তায় মানুষের কোলাহল
রাস্তার ধারে বসে নানা ফলের স্টল
মানুষেও না জেনে কেনে
সেখান থেকে পচা বাসী ফল|
চারিদিকের পোস্টারে লেখা থাকে
জল বাঁচান জল
কিছুদুর গিয়ে দেখবে একটি খোলা কল
সেখান থেকে পড়ছে -
ঝরঝর করে জল ||

মা কবে আসবে ?

তিতাস মুখোপাধ্যায়

কলম উঠিয়ে পড়ব আমি দুর্গাপূজার আগে
পুজোর সময় মজা শুধু, নেই কোন ঝঞ্ঝাটে

পুজোর সময় কিনব নতুন স্কার্ট,
যাতে আমি হই খুব স্মার্ট

বৃষ্টিতে মা আসবে, বিসর্জনও জলে
ঠান্ডা লাগেনা মায়ের আমার কেন তবে ?
সবাই শুধু চায় কলম, আমি চাই মুক্তি
সব ছেড়ে দাও, মা আসছে আজ কি |

ঐশিকি সিনহা, বয়স - ৪ বছর, শ্রেণী - কিন্ডারগার্ডেন, হরিয়ানা বিদ্যামন্দির

লেখক-লেখিকা পরিচিতি

ছোট্ট অনুরোধ ছিল রচয়িতাদের কাছে, নিজেদের একটি করে ক্ষুদ্রায়তন পরিচয়পত্র দেওয়ার জন্যে - কয়েকজন দিয়েছেন, বাকিরা অন্তরালে থাকতেই পছন্দ করেছেন।

চন্দন মাইতি

জীবনে প্রথমবার ও একবারই রোলনাম্বার এক ডিজিটের ঘরে আসার পর, ক্লাস টেন-এ হেডমাস্টার জিজ্ঞেস করেছিলেন কি হতে চাও?

ইঞ্জিনিয়ার কি বোঝার আগেই, উত্তর ছিল: ইঞ্জিনিয়ার। হলাম-ও।

১৫ বছর পর, নতুন হাতেখড়ি হলো, বন্ধুর কৃপায়, অনেকটা জীবনদানের মতো। দেখলাম, অন্ধ কালো ফেলে আসা কুয়ায় এখনো জল আছে। সে জল কি পরিবেশনের যোগ্য? কি জানি?

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

নিজের লিয়ে লেখত্যা হবেক নকি ! দাঁড়াও হে, অল্প হ্যাঁস্যে লি। পিজ্জা লিয়ে দু লাইন লেখত্যা লারব্য হে আজ্ঞ্যা, মাড় ভাতের লইগ্যে সরসরাই ল্যাখত্যে পারি। আমার প্রকৃত বাড়ি পুরুলিয়ায়

কৃষ্ণেন্দু দাস, ওরফে গ্যারাকল

গ্যারাকল নামটা দেওয়া অনিরুদ্ধর। কারণ সব এক্সপেরিমেন্ট ব্যাক-কালকুলেশন করে মিলিয়ে দিতে পারতাম। প্রাকটিক্যাল এর খাতায় প্রফেসরদের সই নকল করে দিতাম তাদের, যারা কোনো দিন ল্যাবের মুখ দেখে নি।

এখন IT কোম্পানির দাস আর বউ, এক ছেলে নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে বাস।

অংশুমান নন্দী

আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা,
তার মাঝেতে সাহস করে আমার এ পথ চলা -
পুঁটলিতে কিছু না থাকলেও পথিক।

সূচীপত্র

অভিষেক চক্রবর্তী

ছোটবেলা থেকে চলচ্চিত্র পরিচালনা করার খুব ইচ্ছে ছিল, আমার জীবনে সব ঘটনা ঘটতো আর আমার মনে মনে মিউজিক বাজতো - আমার স্বপ্ন শুরু হওয়ার আগে নাম দেখতাম; ঠিক যেন একটা নতুন সিনেমা শুরু হচ্ছে. কোন দিন শুনেছেন একটা স্বপ্ন যদি কোনদিন মাঝখানে ভেঙ্গে যায় সেটা আবার সেই খান থেকেই পরের দিন রাতে শুরু হচ্ছে? আমার হতো - অবিস্মরণীয়, কিন্তু আমি মিথ্যা বলছি না, এটা হতো আমার, সেই পরিচালক হওয়া আর হয়নি তবে স্বপ্নটা এখনো দেখি, আর সবাই কে দেখতেও বলি, আপাতত চাকুরী সূত্রে ভারতবর্ষের রাজধানীতে বসবাস, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে কলকাতার গলিতে বসবাস করা মনটা নিয়ে নাজেহাল, এই লেখার সুযোগটা সেই নাজেহাল মনটাকে একটু তৃপ্তি দিতে কাজে দিয়েছে, বেশি কথা না বলাই ভালো, লেখা পড়ে ভাল লাগলে না হয় কোনদিন সামনাসামনি বসে কথা হবে, তখন আরো কিছু লেখা, কথায় পরিণত করে জমিয়ে আড্ডা দেব, শারদীয়া শুভেচ্ছা রইলো !

কৌস্তভ চৌধুরী

ইন্টারভিউ বোর্ডে আমার সবচেয়ে অপছন্দের প্রশ্ন ছিলো-- নিজের সম্বন্ধে কিছু বলুন! এখানেও আবার ওই একই সমস্যার সম্মুখীন আমি। নিজের সম্বন্ধে কি বলবো?

বাবা কালিদাস চৌধুরী ও মা উৎপলা চৌধুরীর একমাত্র সন্তান, নাম কৌস্তভ। তবে রাজা ডাক নামটি ভীষণ প্রিয়। আর আমার ব্যারাকপুরের রাজপ্রাসাদে আমি সকলকে নিয়ে খুব আনন্দে থাকতে ভালোবাসি। জীবনে প্রেম এসেছে দুইবার। দ্বিতীয় প্রেমিকা বর্তমানে আমার অর্ধাঙ্গিনী (অদিতি)। আর প্রথম প্রেমিকা? তার প্রতি আমার দায়বদ্ধতা অপরিসীম। তার প্রতি আমার ভালোবাসার ব্যাপ্তি সাগর সমান। তার নাম ভারতীয় রেল। বাবা রণছোরদাস বলেছিলো, কর্মক্ষেত্রে গার্লফ্রেন্ড ও ওয়াইফ এক হলে নাকি পারফেক্ট ম্যাচিং হয়। সেইদিক দিয়ে ভাবতে গেলেও আমি ভাগ্যবান। কারণ আমার মনের কুঠুরিতে যেমন রেল, কর্মস্থানেও সেই রেল ! সকলকে শুভ শারদীয়া প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সূচীপত্র

অরুনোদয় সিনহা

প্রতিদিন নতুন কিছু করাতেই আনন্দ, পৌনঃপুনিকতা একদম না পসন্দ! জীবনের উদ্দেশ্য - Jack of all trades, master of some। ছবি, গিটার, গান আর বাঁশি, এই নিয়ে বেশ আছি।

গৌতম বড়ুয়া

বাবা অনেক সাধ করে নামটা রেখেছিলেন কিন্তু বুদ্ধের ধারেকাছে পৌঁছাতে পাড়ি নি। আমি নাড়াই.... না, মানে জল, পরীক্ষাগারে জল নাড়াই, সিনিয়র কেমিস্ট। জীবনে প্রথম কবিতা লিখেছি, তবে অরুনোদয় চাইলে এটা বাচ্চাদের সেকশনে ঢোকাতে পারে!

অনুভুতি চট্টোপাধ্যায়

ভালো নাম অনুভূতি ডাক নাম জয়।

অনুভবের ব্যাপ্তি অনেকখানি হলেও জয় করতে পারিনি প্রায় কিছুই। উদরপূর্তির জন্যে সামান্য এক চাকরি করতে হয়। তবে সাঁতার কাটার অভ্যাসটা বরাবর স্রোতের বিপরীতেই থেকে গেছে।

সৈকত সাধু

সৈকত সাধু, জন্ম সূত্রে হীরাপুর, পশ্চিম বর্ধমান নিবাসী। চাকরি সূত্রে বর্তমানে জামশেদপুরে থাকি। মা, বৌ, ছেলে নিয়ে আমার সংসার। এক সময় ডায়েরী লিখতাম, কিন্তু কোনো কারণে সব ছেড়ে দিয়েছিলাম, এখানে আবার লেখা শুরু শুধু এই আমার বন্ধু অরুণের জন্য । ও যদি সাহস না দিত তো আর হয়তো লেখা শুরুই করতাম না।।।

অন্তরা মিত্র

উচ্চাকাঙ্ক্ষি কিন্তু দিশেহারা

স্বপ্নের ডানা মেলে উড়তে চাওয়া

কিন্তু বাস্তবের খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকা এক প্রাণ

রাজেন্দ্র আচার্য

নাম - রাজেন্দ্র আচার্য

ধাম - মানিকচাঁদ পল্লী, হীরাপুর

টাইটেল - দিদি শুন লো

সূচীপত্র

একটি আবেদন

সব কয়টি রচনা পড়ে, শুনে, বুঝে, ভেবে আপনাদের কোনটি ভালো লাগলো
তা জানিনা,
আমার কিন্তু বারবার চোখ চলে যাচ্ছে
কচিকাঁচাগুলোর আঁকিবুঁকির পাতা গুলোয়।
শিশুরা বোধ হয় এমনই, অকারণে ভালোবাসতে বড্ডো ভালো লাগে।
এর থেকেই মাথায় একটা আইডিয়া এলো -
পরের সংখ্যাটি শুধু শিশুদের রচনায়, শিশুদের জন্যে রচনায় ভরিয়ে তুললে
কেমন হয় ?

ছড়া, আঁকা, গপ্পো,
আর যা কিছু ওদের আসে অপ্পো-সপ্পো
আর ওদেরকে আমরা বড়োরা কি বলতে চাই
এইসবেই ভরে উঠুক পরের সংখ্যার পাতায় পাতায়।

আপনার বাড়ির, পাড়ার, ফ্ল্যাটের, যেখানে যত কচি -
সব কটার কাছ থেকে কিছু কিছু জোগাড় করে সো-ও-ও-ও-জা ইমেইল করুন
arunoday.sinha@hotmail.com

আর আপনিও লিখে ফেলুন না কিছু শিশুপাঠ্য, কিশোরপাঠ্য,
যা পড়ে, দেখে, শুনে, বুঝে ওদের মুখেও একটা ফিক-হাসি বেরোবে !
ইমেইল ওই একই।

প্রত্যাশায় রইলাম।

পুনশ্চ : মুস্কিল একটাই, এই বইটা ছেপে বেরোয় না। তো আজকালকার কুচেগুলো মোবাইল, ট্যাব আর কম্পিউটার চালাতে কিছু কম যায় নাকি ?! ওরা ঠিক পড়ে নেবে।

প্রচ্ছদ পরিচয়

প্রচ্ছদটি যামিনী রায়ের ঘরানায় অঙ্কিত,
সপরিবার মা দুর্গা, যেখানে অসুরও পরিবারেরই একজন।
বাঙালির সংসার - বাবার চেয়ে মায়ের বেশী,
তাই দেবীর উপস্থিতি প্রথমে চোখে পড়ে।
সাধারণত দেবীর কোলে কার্তিক গণেশ দেখেই আমরা অভ্যস্ত
এখানে সে প্রথাগত সংস্কার ভেঙে
মায়ের কোলে মেয়ে, আর বাবার পাশে ছেলে।
অসুরের অবস্থান নীচে -
সে ট্র্যাডিশনকে ভাঙার কোন চেষ্টা করা হয় নি,
কারণ আসুরিক বলের স্থান সর্বদা নিচে থাকাই বাঞ্ছনীয়।
সর্বোচ্চ স্থান মাতৃশক্তির, তার পাশে শিব,
মাতৃশক্তি হতেই বাকি সব কিছুর উদ্ভব -
শ্রী, বিদ্যা, সিদ্ধি, সম্পদ, বীরত্ব।

ব্যাক কভার ডিজাইন করেছে
শিশুশিল্পী তিতাস মুখোপাধ্যায়

শুভ বিজয়া